BENGAL LIBRARY ASSOCIATION
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

Annual Subscription : Rs. 360.00
Single Issue : Rs. 30.00
ISSN : 0017 - 324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৭৪ | সংখ্যা ৭ | সম্পাদক ঃ শমীক বর্মন রায় | কার্তিক ১৪৩১

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

কথা কও হে অনন্ত অতীত (সম্পাদকীয়) ৩

বীরেন চন্দ ৪

অরুণ কুমার রায় : গ্রন্থাগার আন্দোলনের অর্ধ-শতাব্দীর বন্ধু

সনৎ ভট্টাচার্য ৮

উনিশ শতকে বটতলার প্রকাশক ও বাংলা বই : একটি সমীক্ষা

দেবব্রত মান্না ১২

সরকার-পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিচালন বিধি : একটি পর্যালোচনা

ড: মাধব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২০

হুগলী জেলার আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা : পর্যালোচনা

পরিষদ কথা

শ্রদ্ধেয় অনুপ কুমার সরকারের স্মরণ সভা ২৪

সুশীলকুমার ঘোষ স্মারক বক্তৃতা, ২০২৩ ২৫

আপনি কি আপনার গ্রন্থাগারে লাইব্রেরি সফট্ওয়্যার নেওয়ার কথা ভাবছেন?
ভাবছেন কোন সফট্ওয়্যার নেব, কার কাছ থেকে নেব, ভবিষ্যতে সাপোর্ট পাব তো?
আরো ভাবছেন সফট্ওয়্যারের দাম সাধ্যের মধ্যে হবে তো?

কোহা'র কাস্টমাইজড ভার্সান

(সম্পূর্ণ লিনাক্স-এ (উবুন্তু/ডেবিয়ান) করা এই সফট্ওয়্যার গ্রন্থাগারগুলির দৈনন্দিন কাজে অত্যন্ত সহায়ক)
আমরা এবার

২০০ পেরোলাম

হ্যাঁ, অন্যান্যদের অনেক প্রলোভন কাটিয়ে, শুধু বিশ্বাস আর পরিষেবায় ভরসা করে বর্তমানে ২০০টির বেশি লাইব্রেরি আমাদের কাস্টমাইজড্ কোহা ব্যবহার করছেন। অপেক্ষায় আছেন আরও অনেকে। তাই পরিষদের প্রতি আপনাদের ভালোবাসা, আপনাদের আস্থায় আমরা আপ্লুত। আপনাদের ভরসার কারণঃ

প্রতিষ্ঠানটির নাম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
টেকনোলজির কচ্কচানি নয়, গ্রন্থাগারের মতন করে কাস্টমাইজ করা
মিথ্যে প্রতিশ্রুতি নয়, খোলাখুলি যা করা সম্ভব তা বলা
কোন লুকানো দাম নেই বা এএমসির জন্য জোরাজুরি নেই উপরন্তু ন্যাকের চাহিদামতো রিপোর্ট তৈরি
পুরোপুরি পেশাদারিত্ব এবং ইন্সটলেশনের পাশাপাশি ডাটা এন্ট্রি, বার কোড ও স্পাইন লেবেল লাগান
প্রতিযোগিতার জন্য দামের হেরফের বা কোন অনায্য প্রতিশ্রুতি বা অন্যায় টেন্ডার নয়
সময়মতো সার্ভিস, বিপদে ফেলে পালিয়ে যাওয়া নয় এবং সহযোগিতা, সহমর্মিতা
চিরাচরিত ইনহাউস সার্ভার প্রযুক্তির সাথে অত্যাধুনিক ক্লাউড প্রযুক্তির ব্যবহার
প্রতিনিয়ত সফট্ওয়্যারের ব্যাকআপ দেওয়া, ব্যাকআপ নিয়ে টালবাহানা নয়
ই-মেল অ্যালার্ট, এস এম এস পরিষেবা এবং বিশ্বমানে নির্ভরযোগ্য ট্রেনিং

তাই যারা এখনো আমাদের কাছ থেকে কোহা নেন নি তারা আর দেরি না করে অবিলম্বে ফোন বা ইমেল করুন। আশা করি বাকি ২০০টি লাইব্রেরির মতো আপনিও হতাশ হবেন না।

আমাদের কাস্টমাইজড ভার্সানের পরিষেবার খরচঃ

সাধারণ গ্রন্থাগার – ১০০০০-১৫০০০ টাকা; বিদ্যালয় গ্রন্থাগার – ১০০০০-২০০০০ টাকা; কলেজ গ্রন্থাগার – ২০০০০-৪০০০০ টাকা; বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশেষ গ্রন্থাগার – ৩০০০০-৪০০০০ টাকা

আন্তর্জাতিক মানের কোহা আপনার সাধ্যের মধ্যে এনে দিতে পারে একমাত্র
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, যার নামই ভরসা যোগায়

বিশদে জানতে ফোন/হোয়াট্সঅ্যাপ করুনঃ ৯৪৩২২৯৮৭৪৬ বা মেইল করুনঃ **blacal.org@gmail.com**

গ্রন্থাগার

বর্ষ ৭৪ সংখ্যা ৭ সম্পাদক ঃ শমীক বর্মন রায় কার্তিক ১৪৩১

সম্পাদকীয়

।। কথা কও হে অনন্ত অতীত।।

এই পত্রিকা যখন আপনাদের কাছে পৌঁছাবে তখন শারদোৎসব প্রায় শেষ পর্যায়ে। গ্রন্থাগার পত্রিকার অগণিত পাঠক পাঠিকাদের জানাই বিজয়ার যথাযথ প্রণাম, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।

এই বছরের শারদোৎসব ছিল অভূতপূর্ব। মণ্ডপে মণ্ডপে আলোর মেলা, দর্শনার্থীদের ভিড় যেমন ছিল তেমনি রাজপথ ছিল ন্যায় বিচারের দাবিতে অবিরত সোচ্চার। জুনিয়র ডাক্তারদের স্বাস্থ্য দুর্নীতি, থ্রেট কালচার বন্ধ সহ দশ দফা দাবিতে আমরণ অনশন ও তাকে কেন্দ্র করে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন নাড়িয়ে দিয়েছে আমাদের সকলকে। প্রশাসন মানবিক দৃষ্টিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে দ্রুত সমাধানের অগ্রসর হোক। ইতিমধ্যে নানান প্রশাসনিক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলা হলেও তা অদ্যাবধি ফলপ্রসূ হয় নি। দ্রুত ও বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলি করা হোক। স্বাস্থ্য পরিষেবার মত সংবেদনশীল ক্ষেত্রে অচলাবস্থার সর্বাধিক শিকার হন গরীব, প্রান্তিক ও সাধারণ জনগণ।

মন খারাপ করা এই পরিস্থিতিতেও অত্যন্ত সুখের কথা এই যে দুর্গোৎসবের প্রাক্কালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদীয়া, মালদহ প্রভৃতি জেলায় গ্রন্থাগার কর্মী নিয়োগের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং নতুন অনেক কর্মীবন্ধু কাজে যোগদান করেছেন। পরিসংখ্যানের দিক থেকে বলা যায়, মোট ১৮টি জেলায় ৫০৯টি শূন্য পদের মধ্যে ৩৯৯টি পদ পূরণ হয়েছে। বাকি জেলাগুলিতে নতুন কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা অচিরেই হবে বলে আশা করা যায়। নিয়োগ নিয়ে নানান প্রশ্ন উঁকি মারলেও চাকরিতে নিয়োগপ্রাপ্তদের আমরা জানাই উষ্ণ অভিনন্দন এবং একই সাথে প্রত্যাশা করি যে অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে, দায়িত্বের সাথে গ্রন্থাগার পরিষেবার কাজকে তারা সম্প্রসারিত করবেন। আগামী দিনে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথী হিসেবে আমরা সক্রিয়ভাবে তাদের পাবো সে বিশ্বাস রইল।

ইতিমধ্যে যারা কাজে যোগদান করেছেন তাদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক। যদিও খবর পাওয়া যাচ্ছে বেশ কয়েকটি জেলায় নিয়োগপ্রাপ্ত নতুন কর্মীরা আশানুরূপ দায়বদ্ধতা প্রদর্শন করছেন না। মনে রাখবেন, বহু আন্দোলনের ফলস্বরূপ এই সমস্ত পদগুলির জল পূরণ হয়েছে সেগুলোকে মাঠে মারা যেতে দেবেন না।

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর পরিষদের ৮৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ২০২৪-২৬ বর্ষের জন্য নতুন কাউন্সিল এবং এক্সিকিউটিভ কমিটি গঠন করা হয়। আসন্ন শতবর্ষকে সফল করে তুলতে এই কমিটির নেতৃত্বে আমাদের সকলকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় মুখ্যত দুটি বিষয়ে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ আলোকপাত করেন।

প্রথমত, গ্রন্থাগার পত্রিকার প্রকাশনার বিপুল খরচ কমাতে পত্রিকাকে মাসিক থেকে ত্রৈমাসিকে পরিবর্তিত করা যায় কিনা এবং পাশাপাশি সম্পূর্ণভাবে অনলাইন প্রকাশ করা যায় কিনা সে নিয়েও আলোচনা ওঠে। ভবিষ্যতে সবদিক খতিয়ে দেখে আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে দেওয়া সরকারের বাৎসরিক অনুদান ২০২৩-২৪ সাল থেকে সম্পূর্ণ বন্ধ আছে। স্বাধীনতা পূর্বকাল থেকেই এই অনুদান পরিষদ পেয়ে আসছে এবং বিভিন্ন সময়ে ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২২ সালে সাড়ে নয় লক্ষ টাকা অব্দি সরকারি অনুদান পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু ২০২২-২৩ এ তা কমে দাঁড়ায় সাড়ে ছয় লক্ষ টাকায়। পরিষদের নানান কর্মকাণ্ড অতিবাহিত করার ক্ষেত্রে এই অনুদান একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পরিষদ মনে করে এই আর্থিক সহায়তা কোন ভিক্ষা নয়। বরং শতবর্ষ ধরে রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে পরিষদের অসামান্য ভূমিকার স্বীকৃতির স্মারক এই অনুদান।

অবিলম্বে সরকারের কাছে এই আর্থিক অনুদান প্রাপ্তির ব্যাপারে যথোপযুক্ত ভূমিকায় পরিষদকে যাবার জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সকল সদস্য মতামত প্রকাশ করেন। নতুন কার্যকরী সমিতি এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ভূমিকা নেবেন বলে আমরা আশা প্রকাশ করতে পারি।

অরুণ কুমার রায় : গ্রন্থাগার আন্দোলনের অর্ধ-শতাব্দীর বন্ধু

বীরেন চন্দ*

আমি ১৯৬৬ সালে গ্রন্থাগারে চাকরিতে যোগদানের পর সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের নানা সমস্যার প্রতিকার খুঁজতে গিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সন্ধান পাই। ১৯৭০ সাল নাগাদ পরিষদের দার্জিলিং জেলা শাখা গঠন করা হয়। সেই সময়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অরুণ রায় ছিলেন অন্যতম। পরিষদ অন্তপ্রাণ মানুষটি এই সংগঠনের কাজে সদা ব্যস্ত থাকতেন। পরিষদের কার্যকরী সমিতির সম্ভবত সবকটি পদই তিনি অলঙ্কৃত করেছিলেন। আমৃত্যু তিনি পরিষদের সভাপতি পদে ছিলেন। অরুণবাবু একজন মুক্তমনা অথচ প্রতিবাদী মানুষ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত মানবিক গুণ সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি সন্তোষপুরে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। ঘটনাক্রমে আমিও অবসর গ্রহণের পর সন্তোষপুরে ছেলের ফ্ল্যাটে মাঝে মধ্যে গিয়ে থাকতাম। সেই সময় আমার ও অরুণবাবুর মধ্যে নানা বিষয়ের আলোচনা হতো। তার মধ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা আর পরিষদের এবং সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী সংগঠনের বন্ধুদের খোঁজখবর নেওয়া। অনেকেই প্রয়াত হয়েছেন। তাঁদের কর্মধারা ও অবদান নিয়ে আলোচনা হতো। এরই মাঝে বলতেন, তখন কে কে অসুস্থ আছেন। তিনি নিয়মিত তাঁদের দেখতে যেতেন, এবং প্রয়োজনীয় স্থানে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। এই তথ্য তিনি নিজে কখনও বলতেন না, আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমি তা বের করতাম।

তিনি ময়মনসিংহ জেলার মানুষ ছিলেন। তিনি সর্বস্তরেই ময়মনসিংহ জেলার ভাষায় কথা বলতেন। আমিও ময়মনসিংহ জেলার মানুষ হওয়ায় আমাকে 'ময়মনসিংহ সম্মিলনী'র সদস্য করে নেন। সেই সংগঠন বর্তমানে নেই। তারপর সেই সংগঠন ভেঙে হয়েছে ময়মনসিংহ প্রাক্তনী। আমি সেই সংগঠনের সদস্য হলেও তিনি আর এই নতুন সংগঠনের সদস্যপদ নেননি। তবে এই সংগঠনের সম্পাদক প্রতনু কুমার লাহিড়ী তাঁর স্ত্রী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন বিভাগীয় গ্রন্থাগারিক শুভ্রা লাহিড়ী ও ময়মনসিংহ প্রাক্তনী'র সহ সভাপতি তপন রায়, অরুণবাবু ও আমি কলকাতা আকাডেমি মঞ্চে গৌতম হালদার অভিনীত ও পরিচালিত 'ময়মনসিংহ গীতিকা' নাটক দেখতে গিয়েছিলাম, যার স্মৃতি দীর্ঘদিন আমাদের মনে ছিল। অরুণবাবু এই নাটকের গানগুলিতে শহুরে কৃত্রিমতার সমালোচনা করতেন। একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, আমরা এই পাঁচজনই ময়মনসিংহ জেলার মানুষ। আমাদের চিন্তা চেতনায় ময়মনসিংহ জেলার কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ব্রহ্মপুত্র নদ জুড়ে থাকতো।

১৯৮২ সালটা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাসে স্মরণীয় বছর হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। কারণ ঐ বছরেই শিলিগুড়িতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে প্রায় আটশ' প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সফল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতো সংখ্যক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অতীতে কখনও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নি। অদূর ভবিষ্যতেও কোন সম্ভাবনা নেই — তা এখনই বলা যায়। এই বিশাল কর্মকাণ্ডে কেন্দ্রীয় সংগঠনের যাঁরা নিয়মিত সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁরা হলেন, প্রবীর রায়চৌধুরী, অরুণ রায়, রামকৃষ্ণ সাহা ও কৃষ্ণপদ মজুমদার। এই সময়ে এই প্রথম উত্তরবঙ্গে পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়। ১৯৮২ এবং ১৯৮৩ সালে দুই বছর এই কেন্দ্র থেকে একশ ছাত্র-ছাত্রী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়। এরা সবাই উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলা থেকে নির্বাচিত হয়েছিল। এই দুটি বড় কর্মসূচি সফল করতে উল্লিখিত চারজনও মঙ্গলপ্রসাদ সিন্‌হাকে বার বার শিলিগুড়িতে আসতে হয়েছে। যতদূর মনে পড়ে, গৌতম গোস্বামীও এসেছিলেন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রয়োজনে। শিলিগুড়ি হিন্দি হাইস্কুলে ১৯৮২ সালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী ছায়া বেরা, পার্বত্য উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী দাওয়া লামা, শিলিগুড়ির বিধায়ক বীরেন বসু প্রমুখ। সময়টা ছিল গ্রন্থাগার আন্দোলনের সুসময়! রাজ্যের গ্রন্থাগার আইন পাশ হয়েছে। কয়েক হাজার নতুন কর্মী নিয়োগ হয়ে তারা এই আন্দোলনে যুক্ত হয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি করেছে। সমগ্র রাজ্যেই গ্রন্থাগার বিষয়ে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। যা আজ অস্থমিত প্রায়!

রাজ্যের গ্রন্থাগারে আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব প্রবীর রায়চৌধুরী ও অমিতা রায়চৌধুরীর একমাত্র সন্তান সৌগত

* দূরভাষ - ৯৪৭৪০ ২৮৫২৩

(বাপ্পা) অকালে প্রয়াত হয়। এই গুণবান ছেলেটিকে বিএলএ-র সকলেই অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তার প্রয়াণে পরিষদের সকল বন্ধুরা শোকে মুহ্যমান ছিলেন। প্রবীর রায়চৌধুরী এবং তাঁর স্ত্রী অমিতা রায়চৌধুরী পারিবারিক ভাবে সিদ্ধান্ত নেন, তাঁদের ভবানীপুরের বাড়ির নিচের ভাড়াটেকে কিছু টাকা দিয়ে তুলে দিয়ে সেই ঘরে সৌগত'র স্মৃতিতে শিশু-কিশোরদের জন্য একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করা হবে। সেই সিদ্ধান্ত মতো শিশু-কিশোরদের জন্য যথাসময়ে গ্রন্থাগারটি উদ্বোধন করা হলো। অরুণবাবু এই কর্মকাণ্ডের প্রথম সারিতে ছিলেন।

সৌগত আমাদেরও অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ছিল। শিলিগুড়িতে আমরাও একটি সৌগত'র স্মৃতিতে 'সৌগত স্মৃতি গ্রন্থাগার' গড়ে তুলি। শিলিগুড়ি বাবুপাড়া এলাকায় এই গ্রন্থাগারটি গড়ে তুলতে ঐ এলাকার পৌর কাউন্সিলর বিজয় সিংহ, স্বপন বাগচী এবং উক্ত এলাকার একটি ক্লাব বিশেষ সহায়তা করেছিল। এক সময় কলকাতা গিয়ে গ্রন্থাগার মন্ত্রী ছায়া বেরাকে দিয়ে গ্রন্থাগারটি উদ্বোধনের তারিখ ঠিক করা হয়। গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধি হিসাবে অরুণ রায়ের উপস্থিত থাকার সিদ্ধান্ত হয়। যথাসময়ে মন্ত্রী ছায়া বেরা উপস্থিত ছিলেন উদ্বোধক হিসেবে আর অরুণবাবু উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি হিসেবে। দু'জনেরই স্মৃতিচারণ মূলক বক্তৃতার বিষয় ছিল সৌগত'র নানা গুণপনা। তাঁদের এই মর্মস্পর্শী বক্তব্যে দর্শক শ্রোতাগণও বিষাদগ্রস্ত হয়েছিলেন।

এত কথা বলার প্রয়োজন হলো, কারণ কলকাতা ও শিলিগুড়ি জুড়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনের যে ব্যাপক কর্মকাণ্ড এক কথায় রাজ্য জুড়েই চলছিল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির নেতৃত্বে যার সামনের সারিতে ছিলেন অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী। তাঁর পাশে দক্ষিণ হস্ত হিসেবে ছিলেন অরুণ রায়। প্রবীরবাবুর প্রতিটি কাজে তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করতেন। আর প্রবীরবাবুর পাশে থাকতেন গ্রন্থাগার আন্দোলনের সব শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গ। ফণীভূষণ রায়, মঙ্গলপ্রসাদ সিন্‌হা, সৌরীন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ বিদ্বজন। এঁদের সকলের ভরসার স্থল ছিলেন অরুণ রায়। পরবর্তী সময়ে এই স্থান পূরণ করেছিলেন কৃষ্ণপদ মজুমদার। যিনি এখনো পরিষদের সামনের সারিতে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। অনেকেই জানেন অরুণবাবু একটি বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মচারী সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং একসময় বিরোধী রাজনৈতিক দলের আক্রমণে আত্মরক্ষার জন্য পালিয়ে যেতে হয় এবং চাকরীচ্যুত হয়ে নানাস্থানে ঘুরে বেড়াতে হয়, এমন কি দিনমজুরী করে তাঁকে জীবনধারণ করতে হয়েছে একসময়। আদর্শ ও নীতির জন্য এমন আত্মত্যাগ আমাদের গর্বিত করে। নীতির প্রশ্নে তিনি ছিলেন আপোসহীন, আবার ব্যক্তিমানুষ হিসেবে মানবিকগুণ সম্পন্ন ছিলেন। বন্ধু সহযোদ্ধাদের কোন সমস্যা হলে পাশে দাঁড়াতেন। ভরসা দিতেন। লক্ষ্য করেছি, তিনি প্রবীরবাবুর অনুরাগী, অনুগামী হলেও কোন বিষয় তাঁর দ্বিমত হলে বলতেন, প্রবীরদা, এইটা কি ঠিক হইতাসে? প্রবীরবাবু বুঝিয়ে বলার পর তিনি মেনে নিতেন।

প্রায় সাড়ে তিন দশক সময় আমাকে প্রায় প্রতিমাসে সাংগঠনিক কাজে শিলিগুড়ি-কলকাতা করতে হয়েছে। তার মধ্যে প্রায় এক দশক প্রবীর রায়চৌধুরীর বাড়িতে থাকার সময় প্রতিদিন গ্রন্থাগার পরিষদ অফিস থেকে রাত নয়টা নাগাদ ট্যাক্সি করে প্রবীরবাবু, অমিতাদি, অরুণবাবু, আমিও কোন কোনদিন অসিতাভ দাস থাকতেন। ট্যাক্সি থেকে সবশেষে নামতেন অরুণবাবু। তিনি তখন ভবানীপুরে একটি মেসে থাকতেন। ট্যাক্সি ভাড়া প্রায় প্রতিদিনই প্রবীরবাবুই দিতে চাইতেন, কিন্তু অরুণবাবুও প্রবীরবাবুর আপত্তি সত্ত্বেও জোর করে ভাড়া দিতেন। বিষয়টা হয়তো তেমন কিছু নয়, কিন্তু এর দ্বারা তাঁর চরিত্রের একটা উন্নত মনের পরিচয় পাওয়া যায় যে কোন প্রকার সুবিধাবাদী মানসিকতা তাঁর মনে ছিল না। একবার তাঁর সঙ্গে কলকাতা পিয়ারলেস হাসপাতালে আমার চিকিৎসার ব্যাপারে গিয়েছি। হাসপাতালের অনুসন্ধান কাউন্টারে খোঁজ নিয়েই পাশের কাউন্টারে গিয়ে পকেট থেকে টাকা বের করে আমার নামে অর্থাৎ রোগীর নামে জমা করে দেন। আমি বলি, অরুণবাবু এটা ঠিক হচ্ছে না। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ময়মনসিংহী ভাষায় বলেন, 'আরে রাহেন তো, এইটুকু সবাই করে।' সেই টাকা পরে আমার ছেলে জোর করে তাঁর পকেটে গুঁজে দেয়। এমনই উদারমনা মানুষ ছিলেন তিনি।

রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের যখন সুসময় সেই আটের দশক নয়ের দশকে গ্রন্থাগার আন্দোলনে ও সংগঠনের অত্যন্তরে কয়েকজন বিপথগামী নেতৃত্ব বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি যৌথভাবে যে বিশাল কর্মকাণ্ডের নেতৃত্ব দিতেন তার মধ্যে ভাঙ্গন ধরানোর জন্য তাঁরা বিএলএ এবং পিএলইএ বিরোধ সৃষ্টি করার জন্য ষড়যন্ত্র শুরু করেন। তাঁদের যুক্তি ছিল সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী সংগঠনে কর্মী সংখ্যা বেশি, সভাসমিতিতে তাদের উপস্থিতিতে বেশি সংখ্যক কর্মসূচি সফল হয়। তাই এর নেতৃত্বে কেন

বিএলএ-র নেতারা থাকবেন? বিএলএ নেতৃত্ব মানে প্রবীর রায়চৌধুরী। তাঁর এটা ভাবতেন না বা ভাবতে চাইতেন না যে প্রবীর রায়চৌধুরী শুধু বিএলএ বা পিএলইএ নয়, সামগ্রিকভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন সাংগঠনিক প্রয়োজনে। ভাবতে কষ্ট হয়, এই বিপথগামী চিন্তা-ভাবনার যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁদের ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভমিকা ছিল, বিশেষ করে সাধারণ গ্রন্থাগার সংগঠনে। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হলো, তাঁরা খুবই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা চালিত হতেন। সামগ্রিকভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনের কথা তাঁরা ভাবতেন না। এই চক্রব্যূহের মধ্যে পড়েছিলাম আমি। আমার চারদিকেই ছিল এই বিপথগামী নেতৃত্বের একটা বড় অংশ। সুতরাং দুটি সংগঠনের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখার জন্য নানা জেলায় ছুটতে হয়েছে। একসময় গ্রন্থাগার মন্ত্রী ভিন্ন দলের হওয়ায় প্রশাসনিক সহায়তা পেয়ে এঁরা উৎসাহিত হয়ে ওঠে। আমাদের সৌভাগ্য, এই কঠিন সময় আমরা অতিক্রম করে সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পেরেছিলাম। এই কঠিন সময়ে পাশে থেকে, পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করতেন অরুণবাবু। সাধারণ গ্রন্থাগার সংগঠনের অভ্যন্তরে নানা জেলার নেতৃত্বে ছিলেন, যাঁরা বিভ্রান্ত হননি তারা হলেন হাওড়া জেলার অশোককুমার দাস, জলপাইগুড়ির নীতিশ বসু, মেদিনীপুরের দেবদাস ভট্টাচার্য, বর্দ্ধমানের শিবানন্দ পাল, পুরুলিয়ার হেমন্ত গোস্বামী, দার্জিলিং জেলার নীমপালদেন লেপচা, সুজিত চক্রবর্তী, শ্যামল দত্ত প্রমুখ কর্মীবন্ধুরা অন্যতম।

২০১৮ সালে দার্জিলিং জেলা শাখা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য প্রবীর রায়চৌধুরী স্মারক বক্তৃতা ও একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করা হবে। কিন্তু লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ের প্রশ্নে সদস্যবন্ধুদের সভা ডেকে তাদের অকৃপণ দানেও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। নামে জেলা সংগঠন হলেও ভাষা ও জেলার ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য শিলিগুড়ি মহকুমার মধ্যেই মূলত সাংগঠনিক কাজকর্ম সীমাবদ্ধ রাখতে হয়। কলকাতা গিয়ে প্রথমে বিষয়টা অরুণবাবুকে বললাম। তিনি বললেন, চলুন বিএলএ-তে গিয়ে নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলা যাক। উনি টেলিফোনে বিকেলের দিকে অফিসে আসতে বললেন তাঁদের। সেইমতো আমরা দু'জন সন্তোষপুর থেকে বিএলএ অফিসে যাই। যথা সময়ে এলেন বিমল চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণপদ মজুমদার, গৌতম গোস্বামী, বিশ্ববরণ গুহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। আমি বিষয়টা উত্থাপন করার পর আধ ঘন্টার মধ্যে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত আমাকে জানিয়ে দেওয়া হলো — কেন্দ্রীয় কমিটি সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবেন। অরুণবাবু জানালেন, প্রবীর রায়চৌধুরী অমিতা রায়চৌধুরী মেমোরিয়াল ফান্ডের অবশিষ্ট সাত হাজার টাকাও আমাদের এই তহবিলে দেওয়া হবে। এইভাবে আর্থিক সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়েছিল। আলোচনা সভা ও অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী স্মারক গ্রন্থ 'আলোর যাত্রী', প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল। শিলিগুড়ির সদস্যবন্ধুদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে তিন হাজার টাকা করে দিয়েছিলেন ড. চতুর্ভুজ কুণ্ডু, সঞ্চিত দাস, বৃন্দাবন কর্মকার, সুজিত চক্রবর্তী, শান্তনু চন্দ, ডালিয়া সরকার, জয়িতা সেন, রত্না নন্দী প্রমুখ। পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির জেলা শাখা পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। শিলিগুড়ি ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই তিনজন প্রতিশ্রুতি দিয়েও শেষ মুহূর্তে টাকা দেয়নি। যাই হোক, পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহযোগিতায় ও তাঁদের ছয়জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অত্যন্ত সফল কর্মসূচি পালিত হয়েছিল। স্মারক গ্রন্থ 'আলোর যাত্রী' বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিল। এই কাজগুলির পেছনে থেকে নীরবে সহযোগিতা করতেন অরুণবাবু। এই স্মারক গ্রন্থের জন্য কয়েকটি মূল্যবান লেখা সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন তিনি। তিনি সব সময় প্রচারের আড়ালে থাকতেন, কিন্তু অন্যদের এগিয়ে দিতেন।

অনেকেই জানেন, আমি একটি লিটল ম্যাগাজিন 'উত্তরধ্বনি' সম্পাদনা করি সাড়ে চার দশকের বেশি সময় ধরে। পত্রিকা প্রকাশিত হলে প্রতিবার এক কপি করে পত্রিকা তাঁকে দিই। পড়ে তাঁর মতামত জানাতেন। তিনিও তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে অনেক বই আমাকে দিয়েছেন। সর্বশেষ দিয়েছেন 'প্রসঙ্গ : রবীন্দ্রনাথ' বইটি। জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি প্রকাশিত একটি মূল্যবান বই। আরও দিয়েছেন তাঁর প্রয়াত দাদা অমলকুমার রায় লিখিত প্রবন্ধ গ্রন্থ 'প্রসঙ্গ ও প্রসঙ্গান্তর'। বই উৎসর্গ করেছেন 'অনুজ অরুণ-কে'। বই নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে উঠে এলো লাইব্রেরিয়ানরা বেশির ভাগই বই পড়েন না। অরুণবাবু বললেন, আমরা নিজেরা যদি বই না পড়ি তাহলে পাঠকদের আমরা কি ভাবে সাহায্য করবো!' আমি অরুণবাবুর সঙ্গে সহমত পোষণ করে বলি, বই পড়া ও গ্রন্থাগার ব্যবহার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ থেকে অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তি বহু মূল্যবান কথা বলেছেন। সমাজ, মানুষ ও পরিবেশের প্রয়োজনে আমাদের বই পড়া জরুরি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসের নায়ক শশী ডাক্তার শহরে ডাক্তারী পড়া শেষ করে অজ পাড়াগাঁ গাওদিয়ায় ফিরে এসে

'গ্রামে একটি লাইব্রেরিও নেই' বলে হতাশা প্রকাশ করেছিলেন। এই উপন্যাসের অন্যত্র লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'বই মানুষের অনুভূতির জগতে মার্জনা আনিয়া দেয়'। আমাদের আলোচনার মধ্যে এই সব খ্যাতনামা মানুষদের প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়তো।

দীর্ঘ সময় সন্তোষপুরের ভাড়া বাড়িতে বই নিয়ে, গ্রন্থাগার নিয়ে আলোচনা হতো। আমার উত্তরপাড়ার ঐতিহ্যবাহী গ্রন্থাগারটি দেখার অনেক দিনের ইচ্ছা। অরুণবাবু বললেন, এর পরের বার কলকাতায় আসুন! দু'জনে গিয়ে সময় নিয়ে দেখে আসব। নির্মল চৌধুরী অনেকবার বলেছেন, আসুন একবার! নির্মলবাবু, ও অরুণবাবু বিদায় নিয়েছেন! জানিনা, আমার উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাঠাগার দেখা আর হবে কিনা! এরপর কলকাতা যাব, অথচ অরুণবাবুর সঙ্গে আর দেখা হবে না — এটা ভাবতেই মনটা বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে! ... তবু যেতে দিতে হয়। ... হে বন্ধু বিদায়!

।। সদ্য প্রকাশিত।।

"গ্রন্থাগার" পত্রিকা সম্মিলিত সূচি

ড. অসিতাভ দাশ এবং ড. স্বগুণা দত্ত

প্রকাশক ঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

মূল্য ঃ ৫০০.০০ টাকা

।। সদ্য প্রকাশিত।।

বিশ্বভারতী-শান্তিনিকেতন লাইব্রেরি

এবং

এক অন্য রবীন্দ্রনাথ

লেখক ঃ সুকুমার দাস

প্রকাশক ঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

মূল্য ঃ ২৭৫.০০ টাকা

উনিশ শতকে বটতলার প্রকাশক ও বাংলা বই : একটি সমীক্ষা

সনৎ ভট্টাচার্য*

সহ-গ্রন্থাগারিক, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

উনিশ শতকের পূর্বে বাংলা বইয়ের ছাপাখানা ছিল না। সেইসময় লেখক বই লিখলে, যে সে বই বাজারে বিক্রি হবে সেকথা ভাবা যেত না। কারণ বাংলা বই ছাপা হবে কোথায়? বই পড়বে কে? এই ধরনের বিভিন্ন সমস্যা তখন ছিল। মাতৃভাষা বনাম ইংরেজি ভাষার বিতর্ক তখন ছিল স্পষ্ট। কিন্তু ব্রিটিশ তার ঔপনিবেশিক কাজের গতি আনতে বাংলাভাষার প্রসার শুরু করেছিল। ১৭৪৩ সালের পর বাংলা ছাপা অক্ষর দেখা গেলেও বাংলা বই এসেছে ১৮০০ সালের পর। ব্রিটিশ রাজত্বে প্রথম বাংলাদেশে ছাপাখানা স্থাপিত হয় হুগলি জেলায়। সেই ছাপাখানা থেকে এন.বি.হ্যালহেড এর ব্যাকরণ ''এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ'' ছাপা হয়েছিল ১৭৭৮ সালে। যদিও সেইসময় কলকাতায় কোনো ছাপাখানা ছিল না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রেসে কোনো বাংলা বই ছাপা হতো না। প্রথম বই ছাপার কাজ শুরু হয় শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে। প্রথমদিকে এই প্রেসে ছাপা হত বাইবেলের বাংলা অনুবাদ। মিশনারিদের লক্ষ্য ছিল ধর্মপ্রচার। সাধারণ মানুষের কাছে বিনা পয়সায় বুদ্ধিমান মিশনারিরা বিলিয়ে দিতেন বাংলায় অনুবাদ করা বাইবেল। এই মিশন প্রেসের সর্বময় কর্তা ছিলেন কেরি সাহেব। এই প্রেসেই পরবর্তী সময়ে কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' প্রকাশিত হয়।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পেরিয়ে ১৮১৮ তে কলকাতা স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হবার পর তাদের অধীনে বেশ কিছু স্কুল স্থাপিত হয়। সেই সময় বই জোগান দেবার জন্য কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হয়। অন্য দিক দিয়ে দেখতে গেলে স্কুল বুক সোসাইটিই প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক মুদ্রক, প্রকাশক ও বিক্রেতা।

পরবর্তী সময়ে মনোহর কর্মকারের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রের একটি প্রেস ছিল। সেখান থেকেই ছাপা হয় 'কলিকৌতুক নাটক (১৮৫৮)। আর একটি ভালো প্রেস ছিল শ্রীরামপুরে। যথা কেশবচন্দ্র রায় কর্মকারের জ্ঞানারুণোদয় প্রেস। এই প্রেস থেকেই ছাপা হয় শাতাতপীয় কর্মবিপাক (১৮৫৪), মনুসংহিতা, শঙ্করাচার্যের 'আত্মবোধ', এবং মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট'র একটি পদ্যানুবাদ। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে প্রথম বাঙালি প্রকাশক ছিলেন শ্রীরামপুরের কাছে বহড়া গ্রামনিবাসী গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। তিনি প্রথম দিকে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের কম্পোজিটর ছিলেন। গঙ্গাকিশোর ১৮১৮ সালে ৪৫নং চোরবাগান ভবনে বেঙ্গলী প্রিন্টিং প্রেস এবং বেঙ্গলী গেজেট অফিস প্রতিষ্ঠা করেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে ছাপা বই বা পত্রিকা পড়ার ইচ্ছা বাড়তে থাকে ১৮১৮ সালের পর থেকে। গঙ্গাকিশোর মহাশয়ের প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় 'অন্নদমঙ্গল-বিদ্যাসুন্দর', 'আদিরস', 'রতিমঞ্জরী' এবং প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'বাঙ্গাল গেজেট'। সমাচার দর্পণ প্রকাশিত হবার সময় থেকে শহরে ও মফস্বলে সাধারণ মানুষের মধ্যে বই পড়ার প্রবণতা বিশেষ ভাবে দেখা যায়। যার ফলে কলকাতার 'বটতলা' অঞ্চলে ব্যাঙের ছাতার মতো অসংখ্য নতুন নতুন ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বটতলার চৌহদি ছিল দক্ষিণে বিডনস্ট্রিট ও নিমতলা ঘাট স্ট্রিট পশ্চিমে স্ট্র্যাণ্ড রোড, উত্তরে শ্যামবাজার স্ট্রিট এবং পূর্বে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট। সেইসময় বটতলার ছাপা হত কিছু আদিরসের বই। যেগুলি বাজারে বেশি চলতো। মঙ্গলকাব্যে 'পতিনিন্দা' ছিল, ভারতচন্দ্র ছিলেন, বাসরঘরের কৌতুক ছিল। এছাড়া ছিল কবি, তরজা, পাঁচালী, যাত্রা, ঝুমুর ইত্যাদি। উনিশ শতকের মুদ্রিত সাহিত্য বলতে ছিল বটতলার বিপুল আয়োজন। মালিনী অনায়াসে নানা ধরনের বই নিয়ে পৌঁছে যেত বাবুদের বাড়ির অন্দরমহলে। সেই সময় বটতলা সমাজকে দিয়েছিল রাশি রাশি নকশা, প্রহসন আর রহস্য উপন্যাস। যেমন 'হুতোম প্যাঁচার নকশা (১৮৩৪)। সেই থেকে কলকাতা শহরে দুশো নকশা জাতীয় বই বটতলায় ছাপা হয়। মির্জাপুরে ব্রজমোহন চক্রবর্তীর প্রজ্ঞাযন্ত্রে হিন্দু কলেজের বই ছাপা হত। আমহার্স্ট স্ট্রিটে ছিল রোজারিও প্রেস। টেমার লেনে বিশ্বপ্রকাশ প্রেস। এই প্রেসগুলি বটতলা-প্রকাশক হিসাবে উল্লেখ পাওয়া যায়।

'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হবার পূর্বে বটতলা থেকে 'হেমলতা-রতিকান্ত' (১৮৪৭) প্রকাশ পেয়েছিল। 'কামিনীকুমার' (১৮৫৬) বটতলায় অনেক প্রকাশক দ্বারা অনেক বার ছাপা হয়। বটতলার লেখকরা যথেষ্ট শিক্ষিত না হলেও তারা সমাজচিত্র রচনায় মাটির অনেক

* Email : sanatkbh@yahoo.co.in

কাছাকাছি ছিলেন। তারা সমান্তরাল সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন বলেই আমরা তখনকার সমাজ এবং সংস্কৃতির একটি পূর্ণ চিত্র দেখতে পাই। নকশা প্রহশন আর গুপ্তকথা এই নিয়ে ছিল উনিশ শতকের কলকাতা। দেশীয় লোকের ছাপাখানা প্রথম খিদিরপুরে বাবুরামের ছাপাখানা। সেটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮০৭ সালে। বটতলার বইয়ের প্রধান বার্তাবাহক ছিলেন রেভারেণ্ড জেমস লঙ। উনিশ শতকের ষাটের দশকে তিনিই বটতলার তথা বাংলা বইয়ের প্রধান খতিয়ান লেখক ছিলেন। যতীন্দ্রমোহন সম্পাদিত লঙ-এর প্রথম পুস্তক তালিকার নাম দেওয়া হয়েছিল 'বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থাদির তালিকা'। ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালে। লঙ সাহেব যে তিনটি তালিকা দিয়ে গেছেন তা হল — 1) A Descriptive Catalogue of Bengali works, 1400 Bengali books and Pamphlets; 2) A return of the names and writing of 515 persons, connected with Bengali Literature etc. 1855, 3) Publications in the Bengali language in 1857-1859. বটতলার ছাপাখানা, লেখক, প্রকাশক এবং বই বিক্রেতার একটি পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায় ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত ঐ তালিকা থেকে। এই তিনটি বিভাগের মধ্যে রয়েছে নানা বিষয়ের বই যেমন প্রথম পর্বে রয়েছে শিক্ষামূলক বা পাঠ্যবই, দ্বিতীয় ভাগে পঞ্জিকা, সাময়িকপত্র, সাহিত্য, পাঁচালি, সংগীত, আদিরসাত্মক কাহিনী ইত্যাদি এবং তৃতীয় বিভাগে আছে ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক বই।

বটতলা বইয়ের যে সকল উল্লেখযোগ্য ছাপাখানা ছিল তাদের মধ্যে আহিরিটোলার চৈতন্য-চন্দ্রোদয় প্রেসে ছাপা হয় 'অন্নদামঙ্গল', ৪০ পৃষ্ঠার বই, দাম ২ পয়সা। ভাস্কর প্রেসে ছাপা হয় 'বিদ্যাসুন্দর' ১৯২ পৃষ্ঠার, দাম ১ টাকা। শোভাবাজার বালাখানার জ্ঞানোদয় প্রেসে দাশরথি রায়ের পাঁচালি (৩ খণ্ডে), ৪৮ পৃষ্ঠার বই, দাম ১ আনা। বটতলার 'ভাষা দ্রব্যগুণ' ছাপা হয়েছিল ১০ হাজার, দাম ১ আনা। রাধাবাজারের হিন্দু প্যাট্রিয়ট প্রেসে ছাপা হয় 'রসমঞ্জরী' ৩৮ পৃষ্ঠার, দাম ২ আনা। এছাড়া ছিল আহিরিটোলার কমলাসন প্রেস, শোভাবাজার বালাখানা প্রেস, চিৎপুর রোডের বিন্দুবাসিনী প্রেস ইত্যাদি। লেখক-প্রকাশক সম্পর্কের অপরিহার্য সূত্র প্রকাশকের আর্কাইভস। যেটি ভারতীয় প্রকাশক তাঁদের আর্কাইভস সংরক্ষণ করেননি। অথচ পশ্চিমে গ্রন্থ ইতিহাসের সাম্প্রতিক রমরমার প্রধান কারণ প্রকাশক-আর্কাইভসের সহজলভ্যতা। সেই সময় বাংলা বইয়ের এক একটি সংস্করণ ছাপা হত ৫০০ বা ১০০০ কপি। ৫ হাজার কপি ছাপা হত সাধারণত পঞ্জিকা। পঞ্জিকা থেকে বিজ্ঞাপণ ও খবরাখবর অনেক পাওয়া যেত। সেইসময় বটতলার বইয়ের বিষয়ের কোন তুলনা ছিল না। ধর্ম, পুরাণ, মহাকাব্য, কাব্য সংগীত, নাটক, কাহিনী, যাত্রার বই, পঞ্জিকা, সাময়িকপত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতিষ, অভিধান, শিক্ষা, কারিগরি বিদ্যা — এমন কোন বিষয় ছিল না যা বটতলার কাছে অপরিচিত। সংস্কৃত, ফারসি, উর্দু, ইংরেজি — নানা উৎস থেকে কাহিনী সংগ্রহ করেছেন বটতলার লেখক এবং প্রকাশকরা।

সেই সময় বটতলার প্রকাশনা ছিল বাঙালির কাছে খোলামেলা বিশ্ববিদ্যালয়। আজকের দিনে যাকে বলা হয় 'মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়'। উনিশ শতকের অন্ধকারময় জীবনকে আলোকিত করেছে বটতলার বই। শিক্ষা ও জ্ঞানকে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে 'বটতলার বই' একে ছড়িয়ে দেয় আপামর মানুষের মাঝে। সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকল এই নতুন দিনের আলো। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'র সূচনাতেই স্বীকার করে নিয়েছেন বটতলার বইয়ের ঋণের কথা। তিনি বলেছেন ''চাকরদের মহলে যে সকল বই প্রচলিত ছিল তাহা লইয়া আমার সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত হয়। তাহার মধ্যে চাণক্যশ্লোকের বাংলা অনুবাদ এবং কৃত্তিবাস-রামায়ণই প্রধান''। সেইসময় সমাজের বড়লোকের বাড়ি থেকে মুদির দোকান এমনকি ভৃত্যমহলেও সমাদৃত ছিল বটতলার বই। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত গ্রাম-গঞ্জ-শহরের মানুষকে দিয়েছে সর্বাধিক আনন্দ, দৈনন্দিন জীবনের পথনির্দেশকের দায়িত্ব পালন করেছে বটতলার বই। প্রেমপত্র, তন্ত্রমন্ত্র, বশীকরণ বিদ্যা — সবকিছুই শিখিয়েছে বটতলার বই। 'বাজার' তৈরি বা পাঠক টানতে বটতলার বইয়ের তুলনা হয় না। 'বই কিনে কেউ তো কখনো দেউলে হয়নি' বলে মুজতবা আলি মন্তব্য করলেও বইয়ের দাম দেখে বিমুখ পাঠককে সন্তুষ্ট করেছে বটতলার প্রকাশনা। স্কুল বুক সোসাইটি পাঠককে কিছুটা কম দামে বই দিয়েছে। এমনকি মিশনারিদের বইয়ের দামও আকাশছোঁয়া। যেমন বিদ্যাহারাবলী ১১২ টাকা, কেরির অভিধান ১২০ টাকা। দিন যত এগিয়েছে, ছাপাখানার প্রসার ও প্রতিযোগিতার বাজারে বইয়ের দাম কমতে থেকেছে। বইয়ের দাম কমানোর ক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা নিয়েছিল বটতলা। সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন — ''বটতলা ছাপাখানার দৌলতে বাংলা বই সর্বদা মুদ্রিত মূল্যের কমে বিক্রয় হইত''। তবে এটাও ঠিক বটতলার বইয়ে ছাপার গুণগত মান সবসময় রক্ষা করা হত না। তাছাড়া

বটতলার বেশির ভাগ বই-ই কপিরাইটহীন ছিল। লেখককে নিয়মিত টাকা দেওয়ার কোনো দায় প্রকাশকের ছিল না। তার ফলে বইয়ের দাম কম রাখা সম্ভব হত। আজকের দিনে বই কিনলে কমিশন পাওয়া যায়। কিন্তু সেইসময় একসঙ্গে কয়েকটি বই কিনলে তবেই পাওয়া যেত কমিশন। ১৮৭১ সালে এডুকেশন গেজেট-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় স্কুল বুক সোসাইটির নিয়ম ছিল একসঙ্গে বেশি বই কিনলে ১৫% কমিশন পাওয়া যেত। গুরুপ্রসাদ চট্টোপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এই নিয়ম মেনে গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মাতৃশিক্ষা বইয়ের বিজ্ঞাপনে বলেছেন — ''৫ খান একত্র লইলে অর্থাৎ ১০ টাকায় ১৫ টাকা শতকরা হিসাবে কমিশন''। বটতলা সেই পথই অনসরণ করেছে। এছাড়া বইয়ের কথা জানাতে, বইয়ের প্রতি আকর্ষণ বাড়াতে চাই প্রচার। সে ক্ষেত্রে বটতলা প্রকাশনা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। সেইসময় প্রকাশিত অথবা প্রকাশিতব্য বইয়ের বিজ্ঞাপন নিয়মিত প্রকাশিত হত। কিন্তু বটতলার বইয়ের প্রকাশকরা বিশিষ্ট সাহিত্যপত্র বা সংবাদ পত্রে খুবই কম বিজ্ঞাপন দিত। তাদের পাঠকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ছিল পঞ্জিকা ও বইয়ের ভিতরেই ওই প্রকাশকের অন্য একাধিক বইয়ের সম্মিলিত তালিকা ও বিবরণ। তার সঙ্গে ছিল বিচিত্র টাইপোগ্রাফি ও ছবির ব্যবহার যা পাঠককে আকৃষ্ট করত। কারণ তখন প্রকাশক ও মুদ্রাকর এই দুই সত্ত্বা এক দেহে লীন ছিল। যদিও আজকের দিনে প্রায়শই স্বতন্ত্র সত্ত্বা। তখনকার বিজ্ঞাপনে বইয়ের নাম-দাম, লেখক-নাম ছাড়াও থাকত গ্রন্থরচনার উপাদান পরিচিতি, গ্রন্থটি পাঠের উপকারিতা, ছাপার মান, কাগজের মান, বাঁধাই-এর মান, গ্রাহক মূল্য, সাধারণ মূল্য এবং প্রাপ্তিস্থান। আজকের দিনে সে ভাবে বাংলা বইয়ের কোনো বিজ্ঞাপন দেখা যায় না। কেবল কলকাতা বই মেলার সময় কিছু পত্রিকায় নির্দিষ্ট কিছু বইয়ের বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে বিস্তারিত কিছু থাকে না। তখন বইয়ের আখ্যাপত্রে বা বিজ্ঞাপনে বই কোথায় পাওয়া যাবে তার সঠিক নির্দেশ দেওয়া থাকত। যেমন বিদ্যাসাগরের বেতাল পঞ্চবিংশতি পাওয়া যেত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সেরেস্তাদার তাঁর ভাই দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের কাছে। গৌরীশংকর তর্কবাগীশের শ্রীমদ্ভাগবত পাওয়া যেত জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রালয়ে অথবা 'জোড়াসাঁকোর রাজকৃষ্ণ সিংহের পুষ্পোদ্যানে'। সে সময় বই বিক্রি হত বটতলার নানা ছাপাখানায়, বিভিন্ন বাড়িতে বা প্রতিষ্ঠানের অফিসে। আজকের কলেজ স্ট্রিটে সহস্রাধিক বই বিপণন কেন্দ্র। কিন্তু ১৮২৬ সালের পূর্বে এই অঞ্চলে কোনো বইয়ের দোকান ছিল না। স্কুল বুক সোসাইটি হিন্দু কলেজের কাছে ছাত্রদের জন্য প্রথম একটি বইয়ের দোকান স্থাপন করে ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাঙালিদের বইয়ের ব্যবসা খুব জমে উঠেছিল। আস্তে আস্তে যখন সমাজে বাংলা বইয়ের কদর বাড়ল তখন অনেক শিক্ষিত মানুষ বইয়ের দোকান করার দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। সেই সময় উপার্জন ভালো দেখে বহু বাঙালিও বইয়ের দোকান খুলে বসেছিলেন। বই বিপণনের ক্ষেত্রে বটতলার প্রকাশকরা সাহায্য নিয়েছিল বই-ফেরিওয়ালাদের। তখন ফেরিওয়ালার মাথায় বইয়ের ঝুড়ি সাজানো থাকত বিক্রির জন্য। কারণ এই বই গ্রাম-মফসলে ছড়ানোর দায় ছিল 'বই-ফেরিওয়ালাদের'। বইয়ের সঙ্গে আলতা-সিঁদুর, সুগন্ধি তেল ফ্রিতে দেওয়ার চলও ছিল তখন। তবে বটতলার বইয়ের বিষয়বস্তুর অভিনবত্বের ছিল তার জনপ্রিয়তা। এইরকম একজন ফেরিওয়ালা ছিলেন যার নাম 'মালিনী'। সে নিয়ম করে বটতলার নানাধরণের বই ও পত্র-পত্রিকা নিয়ে হাজির হতো ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে মহিলাদের আনন্দ দিতে। সেই সময় বাড়ির মেয়েরা স্কুলে যেত না। তাদের শিক্ষা জগতের আলো নিয়ে আসতো এই 'বই মালিনী'। কারণ তখন সমাজে মেয়েরা ছিল বন্দি। তাদের বাড়ির বাইরে বেরোনোর অনুমতি ছিল না। তারা লুকিয়ে চুরিয়ে লেখালিখি করত। এমনকি তারা লেখা লিখলে নিজের নাম দিয়ে প্রকাশ করতে পারতো না। যেমন 'দীপনির্বাণ' প্রকাশিত হবার সময় সেখানে লেখকের নাম ছিল না। তবে শোনা যায় ঠাকুরবাড়ির কোনও মেয়ের লেখা। কলকাতার ছাপাখানার সঙ্গে যুক্ত ফেরিওয়ালার সংখ্যা তখন ২০০ জনের বেশি ছিল। তারা পাইকারি দরে বই কিনে শহরতলি, গ্রাম-গঞ্জে ফেরি করত। দ্বিগুণ দামে তারা বই বিক্রি করে মাসে ৬ থেকে ৮ টাকা লাভও করত তখনকার দিনে। সমাজে দারিদ্রতা ছিল চরম তবু লোকে কমিশনের কথা না চিন্তা করে বই কিনতো। প্রচলিত সস্তা কাগজে ছাপা, অল্প দামে, প্রায় সমস্ত সম্ভাব্য বিষয় নিয়ে লেখা বই গোটা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ত সমস্ত ধরনের মানুষের চাহিদা মেটাতে। উত্তর কলকাতা থেকে শুরু করে দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর অবধি প্রেসে ছাপা হত এই সকল বই। সমাজের সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে আনন্দ দিয়ে ভরিয়ে তুলেছিল বটতলার প্রকাশনা। বই পড়ার পাঠক তৈরি করেছে বটতলা। সেই সঙ্গে তৈরি হয়েছে বাংলা বইয়ের বাজার ও অসংখ্য প্রেস।

প্রাচীন বাংলা কাব্য, পুরাণ, লোকসাহিত্য, হিন্দু ও মুসলমানের প্রিয় ধর্মীয় সাহিত্যের প্রকাশ ছিল বটতলার প্রকাশনার প্রথম ও প্রধান অবদান। ছাপাখানার প্রথম দিকে বটতলা প্রকাশনাই ছিল মনোরঞ্জক সাহিত্যের প্রধান পরিবেশক। বটতলার বই যে শুধু সস্তা ছিল তা না, বই চাইলেই বই পাওয়া যেত। বটতলার বইয়ের উল্লেখযোগ্য অবদান হল, বই পাঠককে খুঁজতে হত না বরং বই-ই পাঠককে খুঁজে বের করে নিত। বটতলার প্রকাশকরা কেবলমাত্র বই প্রকাশ করে বসে থাকতেন না, বইয়ের প্রচারেও সমান নজর রাখতেন। যেমন ''এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাদের হাতে কতকগুলো রাঙ্গা ছাপানো কাগজ দিয়া যাইল। তাঁহারা পাঠ করিয়া দেখেন — নূতন পুস্তক, নূতন পুস্তক, 'সংসার-সহচরী' মূল্য-৩ টাকা, পৌষ মাসের মধ্যে লইলে তৎসহ উপহার দেওয়া যাইবে''। এই ছিল বটতলার বিজ্ঞাপনের ভাষা। কেবল বইফেরির কৌশল আর বিজ্ঞাপন নয়, দোকানে সাজিয়ে বই বিক্রিতেও ছিল অভিনব কৌশল। এই বটতলার প্রকাশনার বাজারে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হল প্রকাশনার ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলিম প্রকাশকদের মধ্যে বন্ধুত্ব। যার ফলে এইসব প্রকাশনার প্রকাশকদের দোকান থেকে উনিশ শতকে বহু বাংলা বই ছাপা হয়েছে। যদিও প্রচলিত বাংলা বইয়ের ভাষা থেকে মুসলিম প্রকাশনা বইয়ের ভাষা ছিল পৃথক। এই জন্য রেভা. লঙ তালিকা রচনা করতে বসে ঐ সব বইয়ের নাম দিয়েছেন 'মুসলমানি বাংলা'। দীনেশচন্দ্র সেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ গবেষকরা বলেছেন এই বইগুলি হল মুসলমানি বাংলা সাহিত্য।

আজকের বাংলা সাহিত্যের যে প্রবাহ তাতে বটতলার কিছুটা অবদান অবশ্যই আছে। উনিশ শতকে ছাপাখানার দৌলতে বাংলা সাহিত্যে যে হঠাৎ জোয়ার এসেছিল, তাতে বটতলার ভূমিকা ছিল অনেক। ১৮৫৬ সালের 'অশ্লীলতা নিবারণী আইন'-এর হাত ধরে কিছু রুচিবাগীশ সম্প্রদায় বটতলার বইয়ের বিরুদ্ধে লাগাতার প্রচার চালালেও বটতলার বইয়ের বিক্রি, প্রসার প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল। তাকে আটকানো যায়নি। কলেজ স্ট্রিটের বই প্রকাশনের কথা বলতে গিয়ে অনেকসময়ই আমরা এই ছাপাখানাগুলিকে বাদ দিয়ে থাকি। কিন্তু কলেজ স্ট্রিট বইপাড়া গড়ে ওঠার প্রাক-ইতিহাসে এদের অবদান অনস্বীকার্য। কারণ এই সব প্রহসন-আখ্যান-কাব্য সামাজিক জীবন ও আন্দোলনের এমন সব অন্ধকার জায়গায় আলো ফেলত, এবং এমন খোলামেলা ভাষায় সেগুলো উচ্চারণ করত, যেগুলি তখনকার দিনে উচ্চবর্গের নজরে ভালো লাগত না। আজকের দিনে অনেকে মাতৃভাষার ভালো লেখক হতে চায়। কিন্তু লেখক বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের সংখ্যাও বাড়লে ভালো হত।

তথ্যসূত্র:

১. কবির বউঠান/মল্লিকা সেনগুপ্ত-কলকাতা: আনন্দ, ২০১৮; ISBN 978-81-7756-977-3; পৃ. ১০৯, ১১৩, ১১৪-১১৫

২. ন্যাড়া বটতলায় যায় কবার?/গৌতম ভদ্র-কলকাতা : ছাত্রিম বুকস, ২০১১; ISBN 978-81-9013-886-4; পৃ. ২০৪-২০১৩

৩. বটতলা/শ্রীপান্থ-কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৭; ISBN 81-7215-583-2; পৃ. ১৫-৩১

৪. মুদ্রণের সংস্কৃতি ও বাংলা বই/স্বপন চক্রবর্তী (সম্পা.)-কলকাতা : অবভাস; ২০০৭; ISBN 978-81-904755-4-9; পৃ. ৬১-৭৭

৫. রবীন্দ্র-পরিচয়/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৪২৩ ব.; ISBN 978-81-7522-493-3; পৃ. ৫৬-৬৩

সরকার-পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিচালন বিধি : একটি পর্যালোচনা

দেবব্রত মান্না*

উপ-বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১. ভূমিকা:

ছুটির দিনে বাড়ির সব জমে থাকা কাজকর্ম সেরে সন্ধেবেলায় কিছুক্ষণ বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতদের সাথে এক নির্ভেজাল আড্ডা, অনেক বাঙালির মতো আমারও এ এক পুরোনো অভ্যেস, যাতে সপ্তাহান্তে সত্যিই এক ঝলক সতেজ অক্সিজেন মেলে, সপ্তাহের বাকি কাজের দিনগুলোর জন্য। রাজ্যের আসন্ন লোকসভা নির্বাচন নিয়ে প্রার্থীদের প্রচার, স্লোগান, মিটিং, মিছিলের সাথে পাল্লা দিয়ে সমস্ত টিভি, খবরের কাগজ, অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ার মতো সেদিন আমাদের সান্ধ্য আসরও যখন এ বিষয়ে আলোচনায় সরগরম, তখন স্বপন হঠাৎ করে বলে উঠল, 'কেন দাদা, এসব বড়সড় নির্বাচন বাদ দিন না, আপনাদের সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিচালন কমিটির নির্বাচনের সময় যেন এসব কাদা ছুড়াছুড়ি, হাতাহাতি, মারামারি কিছু হয় না? খ্যাতির বিড়ম্বনা! আচমকা এ কথাতে ঐ আসরে কথা না বাড়িয়ে চুপ করে গিয়েছিলাম ঠিকই। মৌনতা সম্মতির লক্ষণ জানিয়েও গলা নামিয়ে বলেছিলাম, ওসব কিছু কিছু ক্ষেত্রে আগে হয়তো সত্যিই হত, কিন্তু এখন তো আর নির্বাচনই হয় না, তাই ওসবের ঝামেলাও নেই। যাইহোক, সেদিন বাড়ি ফেরার পথেই ঠিক করি, চারদিকের এরকম একটা উত্তপ্ত আবহে আপাততঃ নির্বাচন বিধির প্রসঙ্গ স্থগিত রেখে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির পরিচালন সমিতি ও তার বিধি সম্বন্ধে কিছু লিখে ফেলি, যাতে ভবিষ্যতে এ বিষয়ে কোনো আলোচনার সময় সমস্ত আদেশনামাগুলিকে একসাথে পাওয়া যায়, আর তা যদি কিছু বৃত্তিকুশলী বা কিছু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকারিদের কোনো কাজে লাগে, আর বিশেষ করে তা যদি আজকের এমন হাজারো স্বপন, তাপস, অভিজিতদের সাধারণ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে প্রচলিত ধ্যানধারণা বদলাতে কোনোভাবে কাজে লাগে, এই প্রত্যাশায়। আসলে এটিই হল এ রচনার প্রেক্ষাপট।

২. পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার:

এ কথা অনেকেরই জানা যে, আমাদের রাজ্যে চালু সাধারণ গ্রন্থাগার আইন (Act) অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের (Department of Mass Education Extension & Library Services) অধীন গ্রন্থাগার পরিষেবা অধিকারের (Directorate of Library Services) নিয়ন্ত্রণে, একটি ত্রিস্তরীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় সারা রাজ্যে মোট ২৪৮০টি সাধারণ গ্রন্থাগার (Public Library) তাদের পরিষেবা প্রদান করে, যার মধ্যে আছে ১৩টি সরকারি গ্রন্থাগার (Government Library), ২৪৬০টি সরকার পোষিত গ্রন্থাগার (Government Sponsored Library) ও ৭টি সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার (Government Aided Library)।

২৪৬০টি সরকার-পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগার হল সেই সমস্ত গ্রন্থাগার, যাদের 'প্রায়' সব রকমের (অর্থাৎ ঠিক ১০০ শতাংশ না, কিন্তু আনুমানিক প্রায় ৯৮ শতাংশ) আর্থিক দায় সরকারের ও যেগুলি সরকারের দ্বারা সরাসরি নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত না হয়ে, রাজ্যের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের তৈরি আদেশানুযায়ী প্রতিটি জেলায় 'স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যক' (Local Library Authority) নামে যে একটি করে সিদ্ধান্তকারী সংস্থা (Decision making Authority) আছে, তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ও ঐ বিভাগেরই তৈরি নিয়ম বা আদেশানুযায়ী সেগুলি পরিচালিতও হয়। উপরোক্ত এই ২৪৬০টি সরকার-পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারের মধ্যে আছে:

- জেলা গ্রন্থাগার (District Library): ১৯টি
- শহর / মহকুমা গ্রন্থাগার (Town / Sub-Divisional Library): ২৩২টি
- গ্রামীণ / প্রাইমারি ইউনিট / এলাকা গ্রন্থাগার (Rural / Primary Unit / Area Library): ২২০৯টি

৩. সরকার-পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির পরিচালন বিধি:

১৯৭৯ সালে আমাদের রাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার আইন চালু হওয়ার পর, সেই আইনের ২৩ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে, সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির সুষ্ঠভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় কিছু পরিচালন বিধি (Management rules) তৈরি হয়েছে। আইন চালুর পর

* দূরভাষ - ৮৭৭৭২ ৫৯৪৭৪

সর্বপ্রথম, সরকারি আদেশনামা নং ৫৫-ইডিএন.(এস.ই.), তাং ০৯.০২.১৯৮০-এর মাধ্যমে, সেই সময়ে আমাদের রাজ্যের ব্যক্তিগত উদ্যোগে চালু বিভিন্ন বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলিকে সরকারি পোষণভুক্তির ছত্রছায়ায় নিয়ে আসার জন্য অনেক বিষয়ের মধ্যে গ্রন্থাগারগুলির পরিচালন, নির্বাচন ও পরিবর্তনের বিষয়েও (... procedure to be followed in the matter of selection and conversion of the existing libraries under private management into sponsored ones...) একটি সরকারি আদেশনামা প্রকাশিত হয়। সেখানে অন্যান্য নানা বিষয়ে পথনির্দেশিকা দেওয়ার সাথে সাথে তার অনুচ্ছেদ C(b)-তে বলা হল, এই ধরনের পরিবর্তনের সময় গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনার জন্য তাদের সম্মতি নিয়ে, তাদের সাথে একটি পরিস্কার চুক্তিপত্র করা প্রয়োজন, যাতে সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য কিছু শর্তাবলীর উল্লেখ থাকবে। তারপর ঐখানেই পরিচালনার বিষয়ে আবার বিশদে না হলেও অল্পবিস্তর বেশ কিছু কথা বলে দেওয়া হল। কিন্তু আক্ষরিক অর্থে এই আদেশনামাটিকে ঠিক 'পরিচালন বিধি' বলে বলা যায় না।

রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগার আইন চালুর পর সরকার-পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির সুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য 'পরিচালন বিধি' হিসেবে আলাদা করে যে সমস্ত সরকারি আদেশনামা প্রকাশিত হয়, সেগুলি হল :

১. আদেশনামা নং ৬৭৯-ইডিএন(এস.ই.), তাং ০৩.১১.১৯৮১, যা এ বিষয়ে প্রকাশিত প্রথম সরকারি আদেশনামা। তখনকার রাজ্য সরকারের অবিভক্ত শিক্ষা বিভাগের অধীন সমাজ শিক্ষা শাখার প্রকাশিত এই আদেশনামায় পরিচালন কমিটির গঠন কি হবে, সে বিষয়ে সরকার-পোষিত সব স্তরের গ্রন্থাগারের জন্যেই কিন্তু একইরকম পরিচালনার কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছিল।

২. এরপর পরিচালন বিধি বিষয়ে দ্বিতীয় সরকারি আদেশনামা প্রকাশিত হয়, আদেশনামা নং ২৯১-ইডিএন(এস.ই.), তাং ২১.০৪.১৯৮৪-এর মাধ্যমে ও তার আংশিক পরিবর্তন হিসেবে প্রকাশিত সরকারি আদেশনামা নং ৪৭৪-ইডিএন.(এস.ই.), তাং ১৭.০৮.১৯৮৭, আদেশনামা নং ৭৯৫-ইডিএন(এম.ই.ই), তাং ০৫.০৭.১৯৯৫, আদেশনামা নং ১২১১-ইডিএন(এম.ই.ই), তাং ২৬.১০.১৯৯৫ ও আদেশনামা নং ১২৯৪-ইডিএন(এম.ই.ই), তাং ২১.১১.১৯৯৫-এর মাধ্যমে। উপরোক্ত এই আদেশনামাগুলিতে সর্বপ্রথম, সরকার-পোষিত জেলা গ্রন্থাগারগুলির জন্য একরকম পরিচালন সমিতি ও জেলা গ্রন্থাগারগুলি ছাড়া বাকি সব ধরনের পোষিত গ্রন্থাগারগুলির জন্য আর একরকম পরিচালন সমিতি গঠনের কথা বলা হল। তখন, অর্থাৎ ১৯৯৫ সালের মধ্যে কিন্তু রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি তৎকালীন রাজ্য সরকারের অবিভক্ত শিক্ষা বিভাগের অধীন সমাজশিক্ষা শাখা থেকে রাজ্য সরকারের জনশিক্ষা প্রসার বিভাগে চলে এসেছিল।

৩. পরিচালন বিধি বিষয়ে তৃতীয় ও সর্বশেষ সরকারি আদেশনামা প্রকাশিত হয়, আদেশনামা নং ৫৯৯-ইডিএন(এম.ই.ই)/এসইসিটিটি, তাং ১০.০৮.২০০৫ ও তার আংশিক পরিবর্তন হিসেবে প্রকাশিত আদেশনামা নং ৩৫৭-এম.ই.ই/এসইসিটিটি, তাং ০৩.০৫.২০১৭-এর মাধ্যমে। ২০০৫ সালে যেখানে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি রাজ্য সরকারের জনশিক্ষা প্রসার বিভাগের অধীনে ছিল, ২০১৭ সালে ইতিমধ্যে সেগুলি রাজ্য সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের অধীনে চলে এসেছিল।

৪. সরকার-পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির পরিচালন বিধি: একটি তুলনামূলক আলোচনা

সাধারণ গ্রন্থাগার আইন চালুর পর আমাদের রাজ্যের সরকার-পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির সুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার লক্ষ্যে আজ পর্যন্ত মোট ৩টি প্রধান সরকারি পরিচালন বিধি প্রকাশিত হয়েছে। সময় ও প্রয়োজনের সাথে তাল মিলিয়ে এইসব পরিচালন বিধিগুলিতেও বেশকিছু পরিবর্তন এসেছে। এইসব পরিচালন বিধির কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করে তাদের একটি তুলনামূলক সারণি তৈরি করার চেষ্টা করা হল, যাতে একঝলকে যে কেউ এই বিবর্তনগুলিকে সহজেই বুঝতে পারেন, আগের বিধি থেকে পরের বিধিতে কি কি ফারাক বা কি কি সংযোজন-বিয়োজন হল, তাও সহজেই বুঝতে পারেন। নীতি নির্ধারণকারিদেরও এটি কাজে লাগতে পারে, যখন ভবিষ্যতে তাঁরা কোনো নতুন বিধি তৈরি করবেন। সারণিটি হল এরকম:

ক্রমিক সংখ্যা	পরিচালন বিধির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি	প্রথম আদেশনামা নং ৬৭৯-ইডিএন(এস.ই.), তাং ০৩.১১.১৯৮১	দ্বিতীয় আদেশনামা নং ২৯১-ইডিএন(এস.ই.), তাং ২১.০৪.১৯৮৪ ও তার আংশিক পরিবর্তন হিসেবে প্রকাশিত সরকারি আদেশনামাগুলি	তৃতীয় ও সর্বশেষ আদেশনামা নং ৫৯৯-ইডিএন(এম.ই.ই) /এসইসিটিটি, তাং ১০.০৮.২০০৫ ও তার আংশিক পরিবর্তন হিসেবে প্রকাশিত সরকারি আদেশনামাগুলি
১	আখ্যা	উল্লেখ আছে	উল্লেখ আছে	উল্লেখ আছে
২	সংজ্ঞা	উল্লেখ আছে, মোট ৪টি	উল্লেখ আছে, মোট ৬টি	উল্লেখ আছে, মোট ৯টি
৩	সদস্য	উল্লেখ ছিল, ২ ধরণের – ১. শিশু সদস্য (১৮ বছর বয়স পর্যন্ত) ২. সাধারণ সদস্য (১৮ বছরের বেশি বয়স)	উল্লেখ ছিল, ৩ ধরণের – ১. শিশু সদস্য (১৮ বছর বয়স পর্যন্ত) ২. সাধারণ সদস্য (১৮ বছরের বেশি বয়স) ৩. জেলা গ্রন্থাগারের প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য	উল্লেখ আছে, ৩ ধরণের – ১. শিশু সদস্য (১৮ বছর বয়স পর্যন্ত) ২. সাধারণ সদস্য (১৮ বছরের বেশি বয়েস) ৩. জেলা গ্রন্থাগারের প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য। এছাড়াও আজীবন সদস্য হওয়ার কথারও উল্লেখ আছে।
৪	সদস্য চাঁদা	সাধারণ সদস্যদের জন্য বার্ষিক সদস্য চাঁদার উল্লেখ ছিল	সাধারণ সদস্যদের জন্য বার্ষিক সদস্য চাঁদার উল্লেখ ছিল	সাধারণ সদস্যদের জন্য বার্ষিক সদস্য চাঁদার উল্লেখের সাথে আজীবন সদস্য হওয়ার জন্য এককালীন চাঁদার উল্লেখ আছে। শিশু সদস্যের জন্য কোনো চাঁদা লাগবে না বলা হয়েছে।
৫	সদস্যের অধিকার ও সুযোগ সুবিধা	উল্লেখ ছিল	উল্লেখ ছিল	উল্লেখ আছে, একটু বিশদে।
৬	সদস্যপদ বাতিল বা শেষ	উল্লেখ ছিল না	উল্লেখ ছিল না	উল্লেখ আছে
৭	সদস্যপদ বন্ধ বা অবসান	উল্লেখ ছিল না	উল্লেখ ছিল না	উল্লেখ আছে

৮	পরিচালন সমিতির কার্যকাল	উল্লেখ ছিল, সব স্তরের গ্রন্থাগারের জন্যেই একইরকম পরিচালনা সমিতি গঠনের কথা বলা হয়েছিল	উল্লেখ ছিল, জেলা গ্রন্থাগারগুলির জন্য একরকম পরিচালন সমিতি ও জেলা গ্রন্থাগারগুলি ছাড়া বাকি সব ধরণের গ্রন্থাগারগুলির জন্য আর একরকম পরিচালন সমিতি গঠনের কথা বলা হয়েছিল	উল্লেখ আছে, জেলা গ্রন্থাগারগুলির জন্য একরকম পরিচালন সমিতি ও জেলা গ্রন্থাগারগুলি ছাড়া বাকি সব ধরণের গ্রন্থাগারগুলির জন্য আর একরকম পরিচালন সমিতি গঠনের কথা বলা আছে। ২০১৭ সালের সংশোধনীতে আবার ৩ ধরনের গ্রন্থাগারের জন্য আলাদা আলাদা ৩ রকমের পরিচালন সমিতি গঠনের কথা বলা আছে।
৯	পরিচালন সমিতির কার্যকাল	উল্লেখ ছিল	উল্লেখ ছিল	উল্লেখ আছে
১০	পরিচালন সমিতির ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কাজকর্ম	উল্লেখ ছিল, কিন্তু অল্প কথায়	উল্লেখ ছিল, কিছুটা বিশদে	উল্লেখ আছে, অনেকটা বিশদে
১১	পরিচালন সমিতির সদস্যদের নির্বাচন	আলাদা করে নির্বাচন বিধি না থাকায় নির্বাচন সম্বন্ধে কিছু কথা বলা থাকলেও আলাদা আলাদা সদস্যদের নির্বাচনের পদ্ধতির বিষয়ে তেমন উল্লেখ ছিল না	নির্বাচনের পদ্ধতির বিষয়ে আলাদা করে অল্প কিছু কথার উল্লেখ ছিল। এরপর এর সূত্র ধরে আলাদা করে নির্বাচন বিধি প্রকাশিত হয়।	আলাদা করে বেশ কিছু কথার উল্লেখ আছে। তারপরও এর সূত্র ধরে আলাদা করে বিশদে নির্বাচন বিধি প্রকাশিত হয়।
১২	পরিচালন সমিতির সভা	বিশদে না হলেও উল্লেখ ছিল	বিশদে না হলেও উল্লেখ ছিল	উল্লেখ আছে, অনেকটা বিশদে
১৩	সভাপতির ক্ষমতা দায়িত্ব ও কাজকর্ম	আলাদা করে না বলা থাকলেও সভাপতি ও সম্পাদকের ক্ষমতা সম্বন্ধে একসাথে উল্লেখ ছিল	আলাদা করে না বলা থাকলেও সভাপতি ও সম্পাদকের ক্ষমতা সম্বন্ধে একসাথে উল্লেখ ছিল	আলাদা আলাদা করে সভাপতির ক্ষমতা সম্বন্ধে উল্লেখ আছে
১৪	সম্পাদকের ক্ষমতা দায়িত্ব ও কাজকর্ম	আলাদা করে না বলা থাকলেও সম্পাদক ও সভাপতির ক্ষমতা সম্বন্ধে একসাথে উল্লেখ ছিল	আলাদা করে না বলা থাকলেও সম্পাদক ও সভাপতির ক্ষমতা সম্বন্ধে একসাথে উল্লেখ ছিল	আলাদা আলাদা করে সচিবের ক্ষমতা সম্বন্ধে উল্লেখ আছে
১৫	গ্রন্থাগারিকের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কাজকর্ম	আলাদা করে গ্রন্থাগারিকের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কাজকর্ম সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ ছিল না	আলাদা করে গ্রন্থাগারিকের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কাজকর্ম সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ ছিল না	আলাদা আলাদা গ্রন্থাগারিকের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কাজকর্ম সম্বন্ধে উল্লেখ আছে

১৫	গ্রন্থাগারিকের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কাজকর্ম	আলাদা করে গ্রন্থাগারিকের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কাজকর্ম সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ ছিল না	আলাদা করে গ্রন্থাগারিকের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কাজকর্ম সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ ছিল না	আলাদা আলাদা গ্রন্থাগারিকের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কাজকর্ম সম্বন্ধে উল্লেখ আছে
১৬	বার্ষিক প্রতিবেদন, বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব, বার্ষিক সভা	উল্লেখ ছিল	উল্লেখ ছিল	উল্লেখ আছে
১৭	গ্রন্থাগারের আর্থিক-বর্ষ	উল্লেখ ছিল	উল্লেখ ছিল	উল্লেখ আছে
১৮	গ্রন্থাগারের কাজের সময়	উল্লেখ ছিল, বলা হয়েছিল সপ্তাহে কমপক্ষে সাড়ে ৩৮ ঘন্টা, বুধবার পুরো ছুটি, আর বৃহস্পতিবার অর্ধেক ছুটি	উল্লেখ ছিল, বলা হল, অধিকর্তার আদেশমত আর পরিচালন সমিতির সিদ্ধান্ত মত	উল্লেখ আছে, বলা হল, অধিকর্তার আদেশমত আর পরিচালন সমিতির সিদ্ধান্ত মত
১৯	গ্রন্থাগারের তহবিল	উল্লেখ ছিল	উল্লেখ ছিল	উল্লেখ আছে
২০	গ্রন্থাগার তহবিলের ব্যবহার ও আর্থিক লেনদেন	উল্লেখ ছিল	উল্লেখ ছিল	উল্লেখ আছে
২১	গ্রন্থাগারের কর্মী	উল্লেখ ছিল, কিন্তু অল্প কথায়	উল্লেখ ছিল, কিন্তু অল্প কথায়	উল্লেখ আছে, অনেকটা বিশদে
২২	গ্রন্থাগারের নিয়ন্ত্রণ ও সমিতি বাতিল	উল্লেখ ছিল, কিন্তু অল্প কথায়	উল্লেখ ছিল, কিন্তু অল্প কথায়	উল্লেখ আছে, অনেকটা বিশদে

চেহারার দিক দিয়ে দেখলে, পরিচালন বিধি নিয়ে প্রকাশিত ১৯৮১ ও ১৯৮৪ সালের আদেশনামা দুটিতে খুঁটিনাটি নানা বিষয়ে আদেশের জন্য যেখানে মোট অনুচ্ছেদ ছিল ১৮টি, ২০০৫ সালে প্রকাশিত সেই আদেশনামায় মোট অনুচ্ছেদের সংখ্যা দাঁড়ালো ২২টি। আসলে ১৯৮১ ও ১৯৮৪ সালের আদেশনামা দুটি ছিল প্রায় একটি আরেকটির সংশোধনী। বিধি দুটির আখ্যা অংশেও একই আখ্যা রাখা হয়, ২০০৫ সালে এসে যার কিছুটা পরিবর্তন হয়।

১৯৮১ সালের আদেশনামা থেকে ১৯৮৪ সালের আদেশনামার ফারাক হল প্রধানতঃ দু জায়গায় — এক, পরিচালন বিধির সূত্র ধরে আলাদা করে নতুন আদেশনামার মাধ্যমে নির্বাচন বিধি প্রকাশ, ও দুই, আগের সব স্তরের গ্রন্থাগারের জন্যই একইরকম পরিচালনা সমিতি গঠনের বদলে জেলা গ্রন্থাগারগুলির জন্য একরকম পরিচালন সমিতি ও জেলা গ্রন্থাগারগুলি ছাড়া বাকি সব ধরনের গ্রন্থাগারগুলির জন্য আর একরকম পরিচালন সমিতি গঠনের কথা বলা হল।

আবার ১৯৮৪ সালের আদেশনামা থেকে ২০০৫ সালের আদেশনামারও ফারাক হল বেশ কয়েকটি জায়গায়:

(১) সাধারণ সদস্যদের মধ্য থেকে বার্ষিক সদস্য চাঁদার উল্লেখের সাথে আজীবন সদস্য হওয়ার কথারও প্রথম উল্লেখ করা হল।

(২) নবসাক্ষর বা বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের সাধারণ গ্রন্থাগারে সদস্য হওয়ার জন্য কোনো চাঁদা লাগবে না প্রথম বলা হল।

(৩) আগে কোনো একটি বিষয় সম্পর্কিত আদেশ আদেশনামার বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, পরের আদেশনামায় কোনো একটি বিষয় সম্বন্ধে আদেশ যথাসম্ভব একসাথে আনার চেষ্টা করা হল।

(৪) সময় ও প্রয়োজনের সাথে তাল রেখে একদিকে যেমন সদস্যপদ বাতিল বা শেষ হওয়ার কথা, সদস্যপদ বন্ধ বা অবসান হওয়ার কথা বলা হল, তেমনি পরিচালন কমিটির সভাপতি, সম্পাদকের সাথে গ্রন্থাগারিকের ক্ষমতাও আলাদা আলাদা করে উল্লেখিত হল। তেমনি আবার দৈনন্দিন গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগারিকের হাতে নগদ পয়সা রাখার পরিমাণও আগের থেকে বাড়ানো হল।

এরপর আবার ২০০৫ সালের আদেশনামার ২০১৭ সালের সংশোধনীতে বেশ কয়েকটি জায়গায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এল, যেমন:

(১) পরিচালন সমিতির সদস্যদের নির্বাচনের বদলে মনোনয়নের কথা বলা হল, অর্থাৎ পরোক্ষভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি আর আস্থা না রেখে মনোনয়নের ওপর ভরসা করা হল।

(২) আগের তিন ধরনের গ্রন্থাগারের জন্য দু ধরনের পরিচালন সমিতি গঠনের বদলে তিন ধরনের গ্রন্থাগারের জন্য তিন রকমেরই পরিচালন সমিতি গঠনের কথা বলা হল।

(৩) সাধারণ সদস্য বা পাঠকদের মধ্য থেকে সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে এই প্রথম তাদের গ্রন্থাগার ব্যবহার, পড়ার অভ্যেসের সাথে তাদের সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান ও সক্রিয় অংশগ্রহণকেও সদস্য হওয়ার মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করার কথা বলা হল। তাছাড়া এই ধরনের সদস্যদের মনোনয়নের ক্ষেত্রে এই প্রথম মহিলাদেরও ন্যূনতমসংখ্যক মনোনয়ন বাধ্যতামূলক করা হল।

(৪) জেলা গ্রন্থাগারগুলি ছাড়া বাকি দু ধরনের গ্রন্থাগারগুলির জন্য স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যক মনোনীত সভাপতি মনোনয়নের ক্ষেত্রে তার ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা গ্র্যাজুয়েট হতে হবে বলে এই প্রথম বলা হল। এছাড়াও বাস্তব অভিজ্ঞতার বিচারে এই প্রথম কোনো একজন সদস্য একটানা তিনটি পরিচালন সমিতির সভায় উপস্থিত না থাকলে তার সদস্যপদ বন্ধ বা অবসানের কথা বলা হল।

৫. উপসংহার:

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত আমার আগের একটি রচনায় (দেবব্রত মান্না। সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবার মানোন্নয়নে বিভিন্ন সিদ্ধান্তকারী সংস্থার ভূমিকা : পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার আইনের আলোকে। গ্রন্থাগার, বর্ষ ৭২, সংখ্যা ১২, চৈত্র, ১৪২৯, পৃ. ১৯-২৬) ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে, রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবার মানোন্নয়ন, সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে, গ্রন্থাগার আইনের নির্দেশমত রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার তিনটি স্তরের প্রতিটিতেই যেমন একটি করে সিদ্ধান্তকারী সংস্থা / উপদেষ্টা কমিটি (Decision making authority) করে দেওয়া হয়েছে, তেমনি প্রতিটি স্তরেই যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে সেই স্তরের কার্যনির্বাহী সংস্থা / ব্যক্তিদের (Implementing agency) ও চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে তাদের সংশ্লিষ্ট কাজকর্মও। কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে উপযুক্ত নীতি নির্ধারণ ও পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য, প্রতিটি স্তরের সিদ্ধান্তকারী/উপদেষ্টা সমিতির সাথে যুক্ত বিভিন্ন মাননীয় সদস্যদের দায়িত্বও আলাদা আলাদা করে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে। সেইমত, কোনো একটি সাধারণ গ্রন্থাগারের স্তরে সিদ্ধান্তকারী সংস্থা/উপদেষ্টা সমিতি হল, ঐ গ্রন্থাগারের পরিচালন সমিতি। আর তার কার্যনির্বাহী সংস্থা/ব্যক্তি হল, সাধারণ গ্রন্থাগারটির গ্রন্থাগারিকের

কার্যালয়। প্রতিটি স্তরের সিদ্ধান্তকারী সংস্থাগুলিতে নানা ধরণের ক্ষেত্র থেকে এত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মনোনয়নের উদ্দেশ্যই ছিল বা আছে — যাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা সাধারণ গ্রন্থাগারের মানোন্নয়নে তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতালব্ধ সুচিন্তিত ও পরীক্ষিত প্রস্তাব বা সুপারিশ দিতে পারেন। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে যাতে কোনোরকম বধিরতা না আসে, সিদ্ধান্ত যাতে যুগোপযোগী, সুচিন্তিত, সুনির্দিষ্ট, বাস্তবসম্মত হয় ও তা সত্যিকারের মানবকল্যাণে লাগে। গ্রন্থাগার পরিষেবার কার্যনির্বাহী সংস্থার সাথে যাতে জনসাধারণের যোগাযোগ বজায় থাকে, সেই উদ্দেশ্যেও সাধারণ গ্রন্থাগার আইন এভাবেই তৈরি হয়েছিল। সবকিছুই হয়েছিল সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবার মানোন্নয়নে। ঠিক মানব শরীরের মতো একটি ব্যবস্থা, দিনরাত ঐ সকল গ্রন্থাগারের পরিচালন সমিতি ও গ্রন্থাগারের কর্মীদের সাথে থাকবে এক নিরন্তর যোগাযোগ, গ্রন্থাগারের ভালো-মন্দ সব বিষয়েই। যুদ্ধং দেহি মনোভাব ছেড়ে, পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত বা পরিকল্পনা করে তাদেরকে ঠিকঠাকভাবে কাজে লাগাতে পারলে আজও সরকারি ক্ষেত্রে সোনা ফলে, একসাথে অনেক কিছু ভালো কাজ করা যায়, অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত।

কিন্তু পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, বর্তমানে অধিকাংশ সাধারণ গ্রন্থাগারে এত সমস্যা রয়েছে যে, তাদের ভারে গ্রন্থাগারগুলি কিছুতেই যেন আর মাথা তুলতে পারছে না। পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে অধিকাংশ গ্রন্থাগারের পরিচালন সমিতির মধ্যেই অনেক দলাদলি, অনেক অযোগ্য লোকের আনাগোনা, অধিকাংশ পরিচালন সমিতি সদস্য ও সেইসব গ্রন্থাগারের কর্মীদের সাথে ঠিকঠাক বনিবনা হয় না। পরিচালন সমিতির সভা যেমন ঠিকমত বা নিয়ম করে অনুষ্ঠিত হয় না, সমস্ত সদস্য নিয়মিত আসেন না, তেমনি মাঝে মধ্যে সভা অনুষ্ঠিত হলেও সেই সব সভায় গ্রন্থাগার বা তার পরিষেবার উন্নয়ন নিয়ে বিশেষ কোন আলোচনা হয় না, যদিও অন্যান্য অনেক বিষয়ে নানা আলোচনা হয় ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আবার কিছু গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার পরিষেবার উন্নয়ন নিয়ে কিছু আলোচনা হলেও ফলপ্রসূ সেইসব আলোচনা যে কোনো কারণেই হোক, ঠিক তার উপরের স্তরে আদৌ বা যথাসময়ে যথাযোগ্য জায়গায় পৌঁছায় না। আর যদিও বা পৌঁছায় সেগুলি সম্বন্ধে কোনো ব্যবস্থা প্রায় নেওয়া হয় না, বললেই চলে। ফলে Planning from the bottom or grassroot level না হয়ে প্রায় সর্বদাই Planning from the top হয়। এতে সাধারণ গ্রন্থাগার আইনের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। বাধ্য হয়ে সাধারণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে প্রায় সবরকম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় প্রধানত সরকারি স্তরেই। স্থানীয় চাহিদা/প্রয়োজন গুরুত্ব না পাওয়ার ফল যা হওয়ার তাই হয়। সরকারের কোষাগার থেকে বছর বছর অর্থ খরচ হয় বটে, কিন্তু তা গ্রন্থাগারের স্থানীয় মানুষদের সত্যিকারের কাজে খুব একটা লাগে না। জনগণের টাকা জনগণের উপকারেই আসে না।

দেশ চালানো মতো আমাদের সাধারণ গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রেও গণতন্ত্র চাই, নাকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে অধিক গণতন্ত্রের বদলে উন্নতমনা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একনায়কতন্ত্রও অধিক ফলপ্রসূ, সেই বিতর্ক চলবেই। কিন্তু আজ, চারদিকের এই গুমোট দুর্নীতির পরিবেশেও আশায় আশায় বুক বাঁধি — ভবিষ্যতে আমাদের রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিও, তাদের দক্ষ ও উপযুক্ত পরিচালন সমিতির সাথে অনেক যোগ্য, অভিজ্ঞ, মেধাবী, তরতাজা তরুণ/তরুণী গ্রন্থাগার কর্মীদের নিয়ে, সবাই মিলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, এ বৃত্তিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে, সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি আরো বেশি করে মানুষের প্রয়োজনে লাগবে, সামনের দিনে খবরের কাগজের প্রথম পাতার শিরোনামে রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগারের উন্নত পরিষেবার কথাও আসবে। অনেকেই হয়তো ভাবছেন, এদেশে সরকারি ক্ষেত্রে এসব তো সোনার পাথরবাটি। জানি, যে ঘুণ দীর্ঘদিন ধরে একটু একটু করে আমাদের শরীরে, সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করেছে, তা হয়তো একদিনে যাওয়ার কথা না। তবে কোনো একদিন অন্ততঃ তার যাওয়ার শুরুটা না হলে, পুরোটা শেষ না হলেও সেই আদর্শের কাছাকাছিও তো কোনোদিন আমরা পৌঁছতে পারবো না। আমার মতো, আমার বন্ধু ঐ স্বপন, তাপস, অভিজিতদের মতো, আজকের এমন হাজারো মানুষ, আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন, আমাদের কাছে কিন্তু তাদের অনেক প্রত্যাশা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

ক. গ্রন্থাগার পরিষেবা অধিকার, জনশিক্ষার প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

খ. শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আদেশনামা নং ৫৫-ইডিএন(এস.ই.), তাং ০৯.০২.১৯৮০

গ. শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আদেশনামা নং ৬৭৯-ইডিএন(এস.ই.), তাং; ০৩.১১.১৯৮১

ঘ. শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আদেশনামা নং ২৯১-ইডিএন(এস.ই.), তাং ২১.০৪.১৯৮৪, আদেশনামা নং ৪৭৪-ইডিএন(এস.ই.), তাং ১৭.০৮.১৯৮৭

ঙ. জনশিক্ষা প্রসার বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আদেশনামা নং ৭৯৫-ইডিএন(এম.ই.ই.), তাং ০৫.০.১৯৯৫, আদেশনামা নং ১২১১-ইডিএন (এম.ই.ই), তাং ২৬.১০.১৯৯৫ ও আদেশনামা নং ১২৯৪-ইডিএন(এম.ই.ই.), তাং ২১.১১.১৯৯৫

চ. জনশিক্ষা প্রসার বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আদেশনামা নং ৫৯৯-ইডিএন(এম.ই.ই.) /এসইসিটিটি, তাং ১০.০৮.২০০৫

ছ. জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আদেশনামা নং ৩৭৫-এম.ই.ই./ এসইসিটিটি, তাং ০৩.০৫.২০১৭

a) The West Bengal Public Libraries Act, 1979 (With ammendments 1982, 1985, 1993, 1994, 1998 and 2003).

b) Annual Reports of the Directorate of Library Services, Government of West Bengal.

।। বিশেষ বিজ্ঞপ্তি।।

পরিষদের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে গ্রন্থাগার পত্রিকার বিশেষ সংকলন প্রকাশ পাবে এবং সাথে সাথে শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে অন্য আরেকটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ পাবে। পরিষদের শুভাকাঙ্ক্ষী সহ সকলের কাছে অনুরোধ করছি এই বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে এবং অনধিক চার পাতার মধ্যে আপনার লিখিত প্রবন্ধ দুই কপি দ্রুত আমাদের দপ্তরে পাঠিয়ে দিন। লেখা মনোনীত হলে তা অবশ্যই প্রকাশ করা হবে।

TI
TECTONICS INDIA (SSI Unit)
Regd. Off.: 17/8/6/2 Canal West Road, Kolkata-9
Mob. : 9831845313, 9339860891, 9874723355,
Ph.: 2351-4757 / 2352-5390 / 7044215532
Email : tectonics_india@yahoo.co.in
Website : www.tectonicsindia.co.in

* Library Equipments/ Materials
* All type laboratory manufacturer (Chemistry, Geography, Botany etc.)
* MFG.: Library Rack, Almirah, Newspaper, Paper Stand, Fumigation chamber, Periodical display board, Catelogue, Card Cabinet, Wooden & Steel Bench. Reading Table Book Trolly etc.

Conference / Seminar Hall / Dias and seating arrangement
Compact hall construction / all interior for the institution.

হুগলী জেলার আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা : পর্যালোচনা

ড: মাধব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়*

ভাগীরথী (বা হুগলী) নদীর পশ্চিম তীরে হুগলী জেলার ভৌগোলিক অবস্থান। এই জেলার ইতিহাসচর্চার ইতিহাস প্রাচীনতার দাবী রাখে না। হুগলী জেলায় আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার সূত্রপাত করেন মুখ্যত বিদেশী বণিক, নাবিক, প্রশাসক ও পর্যটক। পরোক্ষ ঔপনিবেশিক স্বার্থে হুগলী জেলার ইতিহাসচর্চার শুভ সূচনা হয়। মনে রাখা প্রয়োজন ঔপনিবেশিক শক্তির সম্পদ বৃদ্ধির কাজেই উপনিবেশ ব্যবহৃত ও শোষিত হয়েছে। তাই হুগলীর উপনিবেশে ইতিহাসচর্চা প্রাথমিকভাবে সেই বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের পথকেই প্রশস্ত করে থাকে। মুখ্যতঃ প্রশাসনিক ও ঔপনিবেশিক কাজকর্মের সুবিধার্থে তথা অঞ্চল সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে হুগলী জেলার বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করে ইংরেজ শাসকের উদ্যোগে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয় এবং সাময়িক পত্রপত্রিকায় লেখালিখিও শুরু হয়। ঔপনিবেশকিতার তাগিদে হুগলী জেলায় নৃতত্ত্ব, জনগণনা এবং ভৌগোলিক সমীক্ষার কাজ শুরু হয়েছিল। প্রশাসনিক উদ্দেশ্যমুখী হলেও আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসাবে এই ধরনের সমীক্ষালব্ধ তথ্য নিঃসন্দেহে বিবেচনাযোগ্য। আঞ্চলিক ইতিহাস বিষয়ক সরকারি প্রকাশনার মধ্যে কয়েকটি গেজেটিয়ার উল্লেখযোগ্য যেগুলো আজও জেলার ইতিহাসচর্চায় বিশেষভাবে বিবেচিত ও স্বীকৃত আকরগ্রন্থ। এল. এস. এস. ও'ম্যালি এবং মনোমোহন চক্রবর্তী সম্পাদিত *বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স: হুগলী* শীর্ষক সরকারী প্রকাশনা তথা আকরগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯১২ সালে। ১৯৭২ সালে প্রকাশিত অমিয় কুমার ব্যানার্জী সম্পাদিত *ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স: হুগলী* গ্রন্থে হুগলী জেলার পরিচয় বিশদে পাওয়া যায়। ১৬টি অধ্যায় ও পরিশিষ্ট সম্বলিত এই গেজেটিয়ার থেকে জেলার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া সম্ভব। উল্লেখযোগ্য জেলা বিষয়ক আরো দুইটি সরকারী প্রকাশনা: ১৮৭৫ সাল থেকে জেলাকেন্দ্রিক স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট প্রকাশিত হতে শুরু করে। আর ১৮৮১ সাল থেকে প্রকাশত হয় ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার। সেই সঙ্গে প্রকাশিত হতে শুরু করে তথ্যনির্ভর কিছু রচনা এবং স্মৃতিকথা। ১৮৮৬ সালে এ. জি. বাওয়ার রচনা করলেন 'The Family history of Bansberia Raj'। ঊনিশ শতকের গোড়ার দিকে 'Description of Hindoostan' গ্রন্থ লিখেছিলেন খ্যাতনামা চিকিৎসক ওয়াল্টার হ্যামিল্টন। ঊনিশ শতকের প্রথম দশকে বিভিন্ন জেলার Account লেখা শুরু করেছিলেন ফ্রান্সিস বুকানন। হুগলী জেলা সম্পর্কে হুগলীর ম্যাজিস্ট্রেট এবং কালেক্টর জর্জ টয়েনবী দুটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করলেন। প্রথম গ্রন্থ A Sketch of the administration of the Hooghly district (Bengal Secretariat Press, Calcutta) প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ সালে। এই বছরেই উইলিয়াম কেরী লিখলেন A Missinary tour in the Hugli and Howrah district. অন্য গ্রন্থ Account of the Hooghly district-এর প্রকাশকাল ১৮৯০। টয়েনবী সাহেবের এই গ্রন্থের ভিত্তিতে এক দশক পরে ১৯০২ সালে হুগলী জেলার সিভিল সার্জেন ডি. জি. ক্রফোর্ড রচনা করলেন A brief history of the Hooghly district. ঠিক তিন বছর পরে ১৯০৫ সালে ক্রফোর্ড সাহেব 'A Report on the epidemic of plague in Hooghly' শীর্ষক একটি মূল্যবান প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। চুঁচুড়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিবরণ ক্রফোর্ড সাহেবের এই প্রতিবেদন থেকে পাওয়া যায়। জেলাভিত্তিক সরকারী প্রতিবেদন আঞ্চলিক ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে মূল্যবান।

জেলার ইতিহাস অনুসন্ধানে সরকারী নথিপত্রও বিশেষ সহায়ক। তবে এই ধরনের নথি অধিকাংশই অপ্রকাশিত। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অভিলেখ্যাগার, কালেক্টরেট রেকর্ড রুম ইত্যাদি বিশেষ কিছু সংস্থায় এই সব নথি দেখার সুযোগ মেলে।

এর পরে জেলাচর্চার কাজে দেশীয় ঐতিহাসিকদের উদ্যোগ শুরু হয়। কলকাতার উচ্চ আদালতের উকিল শম্ভুচন্দ্র দে রচিত Hooghly: past and present গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালে। ব্রিটিশ সরকারের কল্যাণমূলক চিন্তাভাবনার অভিজ্ঞান এই গ্রন্থটি। দু'বছর পরে ১৯০৮ সালে শম্ভুচন্দ্র ইংরেজি ভাষায় আরও একটি গ্রন্থ Bansberia Raj লিখলেন। ব্রিটিশ ঘরানায় হুগলীর আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার পদ্ধতি ও ধাঁচ দেশীয় ঐতিহাসিকরা অনুসরণ করতেন। আঞ্চলিক ইতিহাসের মুখ্য বিষয় ছিল রাজ পরিবারের ইতিহাস উপস্থাপন। হুগলী জেলার ইতিহাসচর্চার এই ধারা থেকে

* দূরভাষ - ৯৪৩৩৩ ৭৩৭৬০

মুক্তিলাভ ঘটেছে অনেক পরে। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে হুগলী জেলার আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা শুরু হয়। এই চর্চা পরবর্তীকালে সুধীরকুমার মিত্রের প্রয়াসে সংহত রূপ লাভ করে। বলা ভাল, সুধীরকুমার মিত্র হুগলী জেলার ইতিহাস রচনার পুরোধা পুরুষ। সুধীরকুমার হুগলী জেলার নির্ভরযোগ্য ইতিহাস রচনার পাশাপাশি দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলের বাঙালি সহ অন্যান্য মানুষের ইতিহাসও উপস্থাপন করেছেন। লোকশ্রুতি বা কিংবদন্তীর প্রভাবমুক্ত আঞ্চলিক ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন সুধীরকুমার। আর একজন বঙ্গসন্তান কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয় তাঁর নিজের অঞ্চল বাঁশবেড়িয়া জনপদকে নিয়ে ইংরেজি ভাষায় লিখলেন আর একটি ইতিহাস গ্রন্থ 'Bansberia past and present'। এই প্রসঙ্গে বাঁশবেড়িয়া বিষয়ক আর একটি মূল্যবান গ্রন্থের নাম স্মরণ করতে হয়। ১৯৩৮ সালে কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয় রচিত গ্রন্থটির নাম 'বংশবাটি পরিচয়'। এই গ্রন্থে বাঁশবেড়িয়া অঞ্চলের সহজ সাদামাটা বিবরণ সাদারণ পাঠকের প্রশংসাধন্য হয়েছিল। বিনয় ঘোষের 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থের গুণগত বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেও একই বক্তব্য প্রযোজ্য। তিনিও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার নিরিখে এই জেলার ইতিহাস নির্মাণে প্রয়াসী হয়েছেন। 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থের (প্রকাশক: দীপ প্রকাশন) ২য় খণ্ডের ২৬৫-৪০৮ পৃষ্ঠা জুড়ে আছে হুগলী জেলার বিশদ বিবরণ।

ঔপনিবেশিক ইতিহাসচর্চায় ন্যারেটিভ বা বর্ণনামূলক রূপটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই প্রসঙ্গে Calcutta Review পত্রিকায় প্রকাশিত রেভা. জেমস লঙ-এর দীর্ঘ প্রবন্ধ On the the banks of the Bhagirathi প্রবন্ধটি উল্লেখ্য। লঙ সাহেব এই প্রবন্ধে জি. টি. রোড এবং ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলের ইতিহাস রচনা করেন। লং সাহেবের এই বিবরণে সপ্তগ্রাম থেকে সূতী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের তথ্যবহুল বিবরণ পাওয়া যায়। Calcutta Review ও এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে বাংলার বিভিন্ন জেলা নিয়ে তথ্যনিষ্ঠ গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল ঊনবিংশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত। Calcutta Review পত্রিকায় ব্র্যাডলে বার্ট চন্দননগর সম্পর্কে এক মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন। মাসিক বসুমতী পত্রিকায় (১৯৪৪-৪৭) প্রকাশিত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত হুগলী জেলার ইতিহাস সম্পর্কিত প্রবন্ধসমূহ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

স্বাধীনোত্তর কালে হুগলী জেলার ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে বেসরকারী ও ব্যক্তিগত প্রয়াস বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই প্রসঙ্গে দু-চারটি গ্রন্থের নামোল্লেখ করতেই হয় —

হুগলী কাহিনী: মুনীন্দ্র দেবরায়, ১৯০৪ খ্রী.

উত্তরপাড়া বিবরণ: অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯২০ খ্রী.

হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ: সুধীরকুমার মিত্র, ১৯৪৮ খ্রী.

হুগলী জেলার দেবদেউল: সুধীরকুমার মিত্র, ১৯৭১ খ্রী. (পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৯১ খ্রী.)

তিন শতকে রিষড়া তৎকালীন সমাজচিত্র: কৃষ্ণগোপাল রায়, ১৯৭৫ খ্রী.

হুগলী জেলা: সাহিত্য ও সংস্কৃতি: জগবন্ধু কুণ্ডু, ২০০৩ খ্রী.

হুগলী জেলার রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে কিছু মূল্যবান আকরগ্রন্থ ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। তুষার চট্টোপাধ্যায়ের *স্বাধীনতা সংগ্রামে হুগলী জেলা* (১৯৮৩), হরিহর শেঠ-এর *মুক্তিসাধনায় চন্দননগর* (১৯৫০), অমিয় কুমার ঘোষ-এর *বিপ্লবী ধ্রুবেশ ও দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা (১৪০১ ব.)*, দেবাশিস শেঠ-এর *সৃষ্টি ও সংগ্রামে গণনায়ক বিজয় মোদক* (২০০৬), চন্দননগর সংযুক্ত নাগরিক কমিটি সম্পাদিত *চন্দননগর, জনজাগরণ ও এক জনমঞ্চ* (২০০৭) এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-এর *হুগলী জেলার কৃষক আন্দোলন: ১৯৩৩-২০১৮* (২০১৯) এবং শুভেন্দু মজুমদার সম্পাদিত *কানাইলাল ও চন্দনগর গ্যাং* (২০২৩) এই তালিকা সাম্প্রতিক সংযোজন।

জেলার পারিবারিক ইতিহাস নিয়েও কিছু গ্রন্থের প্রকাশ ঘটেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ শিবেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্রীর *বাঙ্গালার পারিবারিক ইতিহাস* (১ম ও ২য় খণ্ড), দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ের *উত্তরপাড়ার জমিদারবাড়ির ইতিকথা* (২০১৯), প্রমথনাথ বর্মণ রচিত *সিঙ্গুরের স্বর্গীয় জমিদার দ্বারকানাথবাবু ও তাঁহার বংশাবলীর জীবনচরিত* (১৮৮৭), বঙ্গলাল ঘোষ-এর *হুগলী বংশবাটীর দক্ষিণপাড়ার ঘোষ বংশের ইতিবৃত্ত* (১৩৩৭ ব.), প্যারীলাল সোম-এর *আমার ও আমার পূর্বপুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত* (১৮৯৪), সুধীরকুমার মিত্রের *জেজুরের মিত্র বংশ* (১৩৪০ ব.)।

জীবনীমূলক গ্রন্থের মধ্যে অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ-এর *নরদেব শিবচন্দ্র দেব ও তৎসহধর্ম্মিণীর আদর্শ জীবনালেখ্য* (১৯১৮), অনিমা দেবরায়-এর *বাঁশবেড়িয়ার রাণী শঙ্করী ও হংসেশ্বরী মন্দির*, সুধীরকুমার মিত্র-র *মৃত্যুঞ্জয়ী কানাই* (১৩৫৪ ব.), অলোককুমার চক্রবর্তী-র *মহামনীষী জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন* (১৩৯৪ ব.), বসন্তকুমার সামন্ত-র *শহীদ কানাইলাল: নূতন তথ্যের আলোকে* (১৩৯৭ ব.), সুবীর ঘোষ-এর *ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়* (২০১১) বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

বাংলার লোকসংস্কৃতির একটা বড় জায়গা জুড়ে রয়েছে লৌকিক দেবদেবী। বাংলার অন্য জেলার মতো হুগলী জেলার জনপদেও লোকদেবতার প্রভাব আধুনিকতার করাল গ্রাসে ক্ষীয়মান। প্রায় বিস্মৃতির আড়ালে চলে যাওয়া হুগলী জেলার সেই সব লোকদেবদেবী নিয়ে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ এখনো পর্যন্ত প্রায় নেই বললেই চলে। কৌশিক পালচৌধুরী রচিত ৪ খণ্ডে প্রকাশিত *হুগলী জেলার লৌকিক দেবতা* (সৃষ্টি প্রকাশনী, উত্তরপাড়া) থেকে হুগলী জেলার লোক দেবদেবীর সচিত্র বিবরণ কিছুটা পাওয়া যায়।

গ্রন্থের পাশাপাশি এই জেলা থেকে প্রকাশিত সাময়িত পত্রপত্রিকায় হুগলী জেলার ইতিহাস সম্পর্কিত প্রবন্ধ লক্ষণীয়। জেলাচর্চার বহু মূল্যবান উপকরণ হুগলী জেলা থেকে প্রকাশিত নামী-অনামী বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বাংলার প্রথম সাময়িকপত্র ***দিগদর্শন*** প্রকাশিত হয়েছিল শ্রীরামপুর থেকে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। সপ্তগ্রাম সম্পর্কিত ***জার্নাল,*** রবীন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ও শ্রীরামপুর চন্দনগর পৌরনিগম প্রকাশিত ***পুরশ্রী*** পত্রিকা, জগবন্ধু কুন্ডু-র সম্পাদনায় ***সাহিত্য সেতু*** (বাঁশবেড়িয়া), শ্যামল সিংহের সম্পাদনায় ***হুগলি সংবাদ*** (হুগলি) পত্রিকার অবদান হুগলী চর্চায় উল্লেখযোগ্য। বীরভূম-এর সিউড়ি থেকে প্রকাশিত ***রাঢ়কথা*** পত্রিকার হুগলি জেলা সংখ্যাটি (বার্ষিক সংখ্যা ১৪২৬) জেলার ইতিহাসচর্চায় সাম্প্রতিক সুসংযোজন বলা যায়। এই বিশেষ সংখ্যাটিতে হুগলী জেলার মন্দিরের স্থাপত্যবিষয়ক তথ্য ও ইতিহাস বিধৃত রয়েছে। হুগলী জেলা থেকে প্রকাশিত পরিস্থিতি, **চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ** (বর্তমানে অবলুপ্ত), **রূপশালি**, **হুগলী ডাক**, ইত্যাদি সাময়িক পত্রিকা জেলার ইতিহাস কিংবা জেলাচর্চায় নিবেদিত প্রাণ। স্থানাভাবে এই ধরনের সকল পত্র-পত্রিকার উল্লেখ করা সম্ভব হল না। আশা রাখি, ভাবী গবেষকদের উদ্যোগে সেই সব উপকরণ হুগলী জেলার আঞ্চলিক ইতিহাসের পরিসরকে সুষমামন্ডিত করবে। শৌখিন ইতিহাসচর্চাকারীদের ঐকান্তিক ও গভীর অভিনিবেশ-অনুশীলনে হুগলী জেলার ইতিহাস অন্বেষণের কাজ ত্বরান্বিত হবে বলেই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা যায়।

সাময়িক পত্রিকার উল্লেখ প্রসঙ্গে কিছু স্মরণিকার কথাও বলতে হয়। হুগলী জেলার ইতিহাসের অজানা বা অল্প জানা উপাদানও এই সব স্মরণিকায় অল্প-বিস্তর রয়েছে। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, বসন্তকুমার সামন্ত সম্পাদিত হুগলি মহসিন কলেজ সার্ধশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ ১৯৮৬ (হুগলি মহসিন কলেজ, ১৯৮৮)।

হুগলী জেলার ইতিহাসচর্চায় প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এই কাজে নিজেদের নিযুক্ত রেখে জেলার ইতিহাসচর্চার ধারাকে সজীব ও গতিশীল রাখতে সক্ষম হয়েছে। হুগলী জেলা ইতিহাস অনুশীলন কেন্দ্র, ব্যান্ডেলের ইতিহাস সাহিত্য সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র, সবুজের অভিযান, ইনস্টিটিউট দ্য চন্দননগর, হ্যালো চন্দননগর এবং গিরিদূত প্রকাশন জেলাচর্চায় নিয়োজিত আছে। ব্যান্ডেলের ইতিহাস সাহিত্য সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র থেকে দিলীপ সাহা রচিত *সপ্তগ্রামের সন্ধানে* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ২০১১ সালে।

জেলার বিভিন্ন শহর যথা চুঁচুড়া, চন্দননগর, শ্রীরামপুর, কোন্নগর, উত্তরপাড়া, বৈদ্যবাটি, ভদ্রেশ্বর সম্পর্কেও একাধিক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচিত হয়েছে বেসরকারী, সরকারী ও আধা সরকারী উদ্যোগে। সবগুলিই শহরের ইতিহাস হয়ে উঠতে পারে নি। কোনো কোনো গ্রন্থ শহরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নির্দেশক। হরিহর শেঠ সঙ্কলিত *সংক্ষিপ্ত চন্দননগর পরিচয়* প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে। প্রায় সমগোত্রীয় আর একটি গ্রন্থ বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *চন্দননগরের ইতিহাসে চারুচন্দ্র রায়* (চন্দননগর পৌরনিগম, ২০০৯)। ভদ্রেশ্বর শহর-কেন্দ্রিক একটি গ্রন্থ শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *ভদ্রেশ্বর অঞ্চলের ইতিবৃত্ত* (ভদ্রেশ্বর পুরসভা, ১৯৯৪), নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়-এর *আমাদের কোন্নগর* (১৯৯৫), শর্মিষ্ঠা ঘোষ রচিত *ইতিহাসের শ্রীরামপুর* (১৯৯৬), চুঁচুড়া শহরকে নিয়ে অসিত বরণ মুখোপাধ্যায়-এর *শহর চুঁচুড়া* (২০০২), ২০০২ সালে প্রকাশিত হয় বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বিপ্লবতীর্থ চন্দননগর* (চন্দননগর পৌরনিগম), প্রীতিমাধব রায় সম্পাদিত বিপুলায়তনের *শ্রীরামপুর পরিচিতি* (১৪০৭ ব.), প্রভাসলাল

দাস সম্পাদিত *কোন্নগরের ইতিবৃত্ত* (২০১৮), উল্লেখ্য। সুলগ্না চক্রবর্তী ও বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত *চন্দননগরের কাহিনী ও তার ইতিহাস* (২০২১) শহরাঞ্চলের ইতিহাসচর্চায় নবতম মূল্যবান সংযোজন। জেলার শহরাঞ্চল নিয়ে আরো কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। স্থান সংকীর্ণতার কথা ভেবে স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন কিছু গ্রন্থের নামোল্লেখ করা সম্ভব হোল না। আর একটি কথা না বললেই নয়। জেলা সম্পর্কিত কিছু কিছু প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের ইদানিং পুনর্মুদ্রণ হচ্ছে। এর ফলে এই সব দুর্লভ গ্রন্থ স্বল্পায়াসে সংগ্রহ ও পাঠের একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। জেলা চর্চার প্রেক্ষিতে এমন ঘটনা নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক ও ইতিবাচক দিক হিসেবে গণ্য হতে পারে। সুধীর কুমার মিত্র রচিত 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ' এবং 'হুগলী জেলার দেবদেউল' পুনর্মুদ্রিত হয়েছে যথাক্রমে ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ ও ১৯৯১ সালে। কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় রচিত 'হুগলী-কাহিনী'র পুনর্মুদ্রণ হয় ২০২২ সালে।

এবার দেখে নেওয়া যাক জেলা চর্চার পরিসরে ইংরেজি গ্রন্থ প্রকাশনার প্রকৃত চিত্রটি। বাংলা গ্রন্থে তুলনায় এই জেলা সম্পর্কিত ইংরেজি গ্রন্থের প্রকাশনা এখনও পর্যন্ত নিতান্তই অপ্রতুল। জেলা চর্চা বিষয়ক কম-বেশি ৮০টি ইংরেজি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। বর্তমান নিবন্ধের প্রারম্ভে উল্লেখিত দু-চারটি ইংরেজি গ্রন্থ ব্যতিরেকে নীলমণি মুখার্জী, বারিদবরণ মুখার্জী, শিবনারায়ণ মুখার্জী, সুভাষ চন্দ্র সেন, কাঞ্চনা মুখোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্র নাথ সেন, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ গ্রন্থকার রচিত হুগলী জেলা বিষয়ক ইংরেজি গ্রন্থসমূহ জেলা চর্চায় বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

শেষের কথা: নব্বই দশকের গোড়া থেকে হুগলীর আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার প্রকাশনায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যাস্ফীতি ঘটেছে। জেলা বিষয়ক বিভিন্ন প্রেক্ষিতনির্ভর পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। যে সব বিষয়ের সার্বিক গ্রন্থ এখনো প্রকাশিত হয় নি কিংবা হাতেগোনা দুই-একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে হুগলীর লোকসংস্কৃতি ও লোকশিল্প, শিক্ষা (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা), ধর্ম, সংগীত, আর্থ-সামাজিক ইতিহাস, জনজাতির ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্পর্কিত গ্রন্থের অপ্রতুলতা লক্ষণীয়। ফলত, এখনো পর্যন্ত হুগলী জেলার ইতিহাসচর্চার পূর্ণ প্রকাশ ঘটে নি। হুগলীর আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চায় এই অন্তরায়ের দিকটি বিবেচনা করেই জেলার আঞ্চলিক ইতিহাসের গবেষকরা তাদের বিষয়ের পরিসীমা নির্ধারণ করবেন ও জেলাচর্চার ঘাটতি পূরণে যথাসম্ভব প্রয়াসী হবেন। উদ্যোগী হবেন পূর্ণাঙ্গ গবেষণার পাশাপাশি গ্রন্থ রচনার প্রক্রিয়ায়। অনালোকিত ও অনালোচিত বিষয়ের চর্চা ও গবেষণার ধারা হুগলী জেলার ইতিহাসচর্চায় ব্যাপ্তি ঘটাবে। এই জেলার সাধারণের গ্রন্থাগারসমূহ তাদের নিজস্ব জেলার অঞ্চলচর্চা বিষয়ক গ্রন্থসংগ্রহে পুষ্ট হবে।

সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ইতিহাস-অসম্মত তথ্যের হাত থেকেও হুগলী জেলার ইতিহাসকে বাঁচাতে হবে। দু-একটি গ্রন্থে এমন কাল্পনিক ও কিংবদন্তী নির্ভর তথ্যের সমাহার ঘটানো হয়েছে বলেই এই সাবধানবাণী। পরিতাপের বিষয় পেশাদার ঐতিহাসিক ও গবেষকদের মধ্যে হুগলী জেলার আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা আজও অনেকটাই অবহেলিত। সম্প্রতি হুগলী জেলার গ্রন্থ প্রকাশে কিছুটা গতির সঞ্চার হয়েছে। ভাবীকালে জেলার ভূমিপুত্রদের হাত ধরে জেলা সংক্রান্ত গবেষণা, প্রবন্ধ রচনা ও গ্রন্থপ্রকাশের আরো উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। অঞ্চলচর্চার সম্ভাবনার এই দিকটি উল্লেখ করে বর্তমান নিবন্ধের ইতি টানলাম।

তথ্যসূত্র:

১. আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা ও গ্রন্থপঞ্জী/যজ্ঞেশ্বরী চৌধুরী। নবদ্বীপ, নদীয়া: নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, ২০০৮।

২. হুগলী জেলা: সেকাল ও একাল। চুঁচুড়া, হুগলী: কনকশালী রিক্রিয়েশন ক্লাব, ২০১০। ....। চুঁচুড়া, হুগলী: কনকশালী রিক্রিয়েশন ক্লাব, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ (২০২০)।

৩. হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ/সুধীরকুমার মিত্র; সৌমিত্রশংকর সেনগুপ্ত ও পল্লব মিত্র, সম্পা.। কলকাতা: দে'জ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ (২০১৩)।

৪. .....। সুধীরকুমার মিত্র; সৌমিত্রশংকর সেনগুপ্ত ও পল্লব মিত্র, সম্পা.। কলকাতা: দে'জ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ (২০১৩)। খণ্ড ২।

পরিষদ কথা

শ্রদ্ধেয় অনুপ কুমার সরকারের স্মরণ সভা

২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে বঙ্গীয় গ্রন্থাগর পরিষদের প্রাক্তন কর্মসচিব তথা পরিষদের আজীবন সদস্য, পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্সের শিক্ষক এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সহযোগী গ্রন্থাগারিক অনুপ কুমার সরকারের জীবনাবসান হয়েছে। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গত ৫ অক্টোবর, ২০২৪ (শনিবার) বিকাল ৫ টায় এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সহ-সভাপতি শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা। সভার শুরুতে কর্মসচিব জয়দীপ চন্দ বলেন উনি সিরিয়াল সেকসনে ছিলেন এবং একজন সৎ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্সের সূচিকরণ (ব্যবহারিক) পড়াতেন। তিনি অসম্ভব ভালো শিক্ষক ছিলেন। এরপর তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সাহাকে সভা পরিচালনা করার জন্য অনুরোধ করেন।

ড. কৃষ্ণপদ মজুমদার : তিনি বলেন আমরা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একসঙ্গে পড়াশুনা করেছি। অনুপ পরিষদে সূচিকরণ (ব্যবহারিক) পড়াতেন। তিনি পরিষদের অনেক দায়িত্বশীল পদে ছিলেন। শেষের দিকে বাড়ীতে বন্দী হয়ে থাকলেন। মাঝে একবার পানিহাটিতে ৫৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে এসেছিলেন। শেষের দিকে শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই।

গৌতম গোস্বামী : অনুপের বাড়ীতে বন্দী হওয়ার পেছনে অনেকগুলো কারণ আছে। প্রথম কারণ তাঁর স্ত্রী বিয়োগ। দ্বিতীয় কারণ পরিষদে আসার ফলে বাড়ীতে কম সময় ব্যয় করা, তৃতীয় কারণ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল না হওয়া। তাঁর কন্যা অনেক চেষ্টা করেছে তাঁকে সুস্থ রাখার ব্যাপারে। বর্তমানে পরিষদে সূচিকরণ (ব্যবহারিক) পড়াতে যে বইটি ছাত্রদের দেওয়া হয় সেটি তাঁর হাতে তৈরি। রবীন্দ্রনাথের উপর Concordance তৈরি করেছেন যেটি ড. আদিত্য ওহদেদার প্রশংসা করেছেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

বাণী চক্রবর্তী : অনুপ খুব রসিক ছিলো। আমরা একসঙ্গে যখন যাদবপুরে ক্লাসে যেতাম তখন আমাদের হাসির খোরাক যোগাতো। আমি তাঁর ও পরিবারের সকলের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

অর্পিতা সরকার (কন্যা) : বাবা পরিষদে আসতেন। কিন্তু আমাদের কাছে পরিষদ সম্পর্কে কোন আলোচনা করতেন না। আমার শক্তি আমার 'মা'। আর বাবা আমার আদর্শ। দুটি জিনিস নিয়ে আমি এগিয়ে যেতে চাই। এরপর অনুপ সরকারের শ্যালক বক্তব্য রাখেন।

মধুসূদন চৌধুরী : স্যার আমার শিক্ষক। উনি আমাকে রোল নং দিয়ে চিনতেন। আমি এখন কোন শিক্ষক দেখিনি যিনি রোল নং দিয়ে চেনেন। উনি আমাকে একটি বই চুরির বদনাম থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন। ওঁনার শিরদাঁড়া ছিলো সোজা। উনি যখন কর্মসচিব ছিলেন তখন মাঝে মধ্যে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে পরিষদে চলে আসতেন। সকল কর্মীরা ঠিক সময় মতো আসছেন কিনা তা লক্ষ্য রাখার জন্য। ওঁনার বলার ধরণ নিয়ে অনেকে শ্লেষ করতেন। এটা ঠিক ছিল না। ওঁনাকে দিয়ে আমরা অনেক কিছু করাতে পারতাম কিন্তু আমরা তা পারিনি। শেষে পরিবারের কাছে অনুরোধ করেন কোন অসুবিধায় পড়লে যেন তাকে ফোন করেন।

চন্দনা চক্রবর্তী : অনুপ আমার সহপাঠী। ওর প্রতি আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

পুলক কর : অনুপদার সাথে পরিচয় পরিষদে ছাত্র পূর্ণমিলন উৎসবের মাধ্যমে। উনি সভাপতি ছিলেন। কোষাধ্যক্ষ হিসাবে উনি সফল। ILA ও IASLIC সম্মেলনে তিনি দক্ষতার সাথে কোষাধ্যক্ষের ভূমিকা পালন করেন। ওনার প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই।

কেশবলাল চক্রবর্তী : আমার সহকর্মী ছিলেন। ওঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

রামকৃষ্ণ সাহা : অনুপ আমার সহকর্মী ছিল। খুব দুঃখের বিষয় ওর স্মরণসভায় আমাকে বলতে হচ্ছে। মানুষ হিসাবে একজন সৎ মানুষ ছিল। পরিষদের বিভিন্ন পদে দক্ষতার সাথে কাজ সামলেছেন। তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

পরিষদ কথা

সুশীলকুমার ঘোষ স্মারক বক্তৃতা, ২০২৩

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (শনিবার) বিকাল ৫টায় পরিষদ ভবনে সুশীলকুমার ঘোষ স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা। বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়। আলোচ্য বিষয় ছিল — কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও গ্রন্থাগার। সভার শুরুতে কর্মসচিব জয়দীপ চন্দ মঞ্চে আহ্বান জানান শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা এবং অধ্যাপক পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়কে। অধ্যাপক পার্থসারথী মুখোপাধ্যায়কে উত্তরীয় ও পুস্পস্তবক দিয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা। কর্মসচিব বলেন আমাদের সৌভাগ্য এমন একটি বিষয় নিয়ে আজকে আলোচিত হচ্ছে তা সময়াপোযোগী। আজকে অনুষ্ঠানটি ইউটিউবে লাইভ করা হচ্ছে। সহযোগিতায় আছে পুরুলিয়ার পাঠস্পৃহা।

রামকৃষ্ণ সাহা : আমি এই সময়ের অনুপযোগী। কারণ আমি যখন এই পেশায় ছিলাম তখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলে কিছুই ছিল না। আমাদের সময় CDS ISIS ছিল। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যাপারে জাপান অনেক এগিয়ে গেছে। তারা এমন সমস্ত রোবট তৈরি করছে যা চিন্তা করা যায় না। এমনকি স্পেসে যন্ত্রমানব পাঠাচ্ছে। অধ্যাপক পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কাজ করছেন। তিনি এব্যাপারে আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন এবং গ্রন্থাগারে এর প্রয়োগের কথা উল্লেখ করবেন।

অধ্যাপক পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় : প্রথমে তিনি মস্তিষ্কের শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। দেহের ২৫ শতাংশ শক্তি ব্রেনে যায়। মানুষ আগে শিকার করতো, ভক্ষণ করতো তারপর ঘুমাতো। এরপর আসল অস্ত্র তৈরি করা, কৃষিকাজ করা জীবনধারনের জন্য। ইনফরমেশন এজ (Information age) ২০২০ তে শেষ হয়ে গেছে। এখন আমরা মেশিনকে কন্ট্রোল করি। কিন্তু একটা সময় আসবে যখন হয়তো মেশিন আমাদের কন্ট্রোল করবে। তিনি বলেন, ২০১৯-র আগে B.C. বলতে বোঝাতো Before Christ, ২০২১ এ B.C. বলতে বোঝাতো Before Covid আর এখন ২০২৩ এ B.C. বলতে বোঝায় Before ChatGBT। গুগল ও ফেসবুকের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে সঠিক তথ্য দিলে সে সঠিক চিত্র রচনা করবে। আমি পড়বার কক্ষ বানাতে চাই। তার রং, মডেল কি হবে তা জানতে চাইলে সে সঠিক চিত্র গঠন করে দেবে। এরপরে গ্রন্থাগারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ সম্পর্কে বলেন। এখন গুগল-এ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বা ড. এস. আর. রঙ্গনাথন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে গেলে যে তথ্য পাওয়া যায় তা সম্পূর্ণ নয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগে সময় বাঁচবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগে সেবার গুণমান (Quality of Service) বাড়বে। একটি নির্দিষ্ট লেখকের বই কতজন পড়েছেন তার পরিসংখ্যান (Statistics) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে পাওয়া যাবে। গ্রন্থাগারে এর প্রয়োগ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ক্লাস নং, সূচিকরণ, সিমান্টিক এলোকেশন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা করে দেবে। Open access সিস্টেমে কোন তথ্য জানতে চাইলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলে দেবে। এখন মেশিনকে সূচিকরণ, বর্গীকরণের বিভিন্ন ডাটা সরবরাহ করে যদি বলা যায় এর Access point কি হবে, ক্লাস নম্বর বা বিষয় শিরোনাম কি হবে? মেশিন অনায়াসে সেটা বলে বা করে দেবে। মেশিন বলতে Microprocessor, বুদ্ধিমত্তা (Intellegence) কখনও কৃত্রিম (Artificial) হয় না। AI প্যাকেজ তৈরি করতে হয়। মোবাইলে একটা word বলে দিলে সে একটা ধারণা দিতে পারে। কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গোটা বিষয়কে উপস্থাপিত করতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে Next generation word processor. গ্রন্থাগারে RFID আছে। GBT$^{3.5}$ বাক্য তৈরি করতে পারবে। কিন্তু এটাকে expert হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না! যতক্ষণ না সঠিক Imput দেওয়া হবে। একজন ডাক্তার একটি রোগের জন্য সর্বাধিক ১৫টা ঔষধের নাম মনে রাখতে পারেন। কিন্তু তার পরে যদি expert system থাকে তবে 1.5 million ঔষধের নাম মনে রাখবে। তথ্যের ইতিহাস, গবেষণা ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন আছে। এতে সময় সাশ্রয় হবে।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ড. কৃষ্ণপদ মজুমদার। তিনি বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য অনেকেই আসতে পারে নি। তিনি অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় ও উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকার নিয়মাবলি

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা **‘গ্রন্থাগার’ প্রতি ইংরেজি মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে)** প্রকাশিত হয়। **বাৎসরিক চাঁদা সডাক ৩৬০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ১৮০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ৩০.০০ টাকা।**

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। **গ্রাহক চাঁদা বা সদস্যচাঁদা বাকি থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না।** পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। **ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।**

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. **প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলি** মানা প্রয়োজনঃ

ক. রচনার **আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা** (পিনকোড সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা ফুলস্ক্যাপ বা **A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায়** পরিস্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. **রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।** এর বেশি হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে **‘গ্রন্থপঞ্জি’** থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জি বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরেজি তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. **ইংরাজি** ভাষায় রচনার **আখ্যা, লেখকের নাম** এবং **বাংলা ও ইংরেজি** ভাষায় **৭৫ শব্দের** (75 words) মধ্যে **সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT)** থাকা প্রয়োজন।

চ. দুই কপি (হাতে লেখা বা ছাপানো) রচনা জমা দিতে হবে। সষ্ট কপি অনলাইনে পাঠাতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—

i) রচনাটি ‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।

ii) রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি।

iii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।

iv) রচনাটির **‘কপিরাইট’** বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয় না। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরেজি ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না।

৬. **গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের** মূল তথ্য সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরেজি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত **গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন।** ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। **পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।**

৮. **বিজ্ঞাপনদাতাদের** বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরেজি যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের **ইংরেজি ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আগের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে)** পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. **দশ কপির কমে ‘এজেন্সি’** (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য তিনশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। **অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।**

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের **ঠিকানার পরিবর্তন হলে** সঙ্গে সঙ্গে **নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।**

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা **পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা** পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম-৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ ঃ ৮২৭৬০ ৩২১০২

বি.দ্র : গ্রন্থাগার পত্রিকার অনলাইন সংস্করণ পেতে নজর রাখুন পরিষদের ওয়েবসাইট http://www.blacal.org তে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা
এখন পাওয়া যাচ্ছে

- বিমল কুমার দত্ত
  রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার। ১৯৮৯।
  মূল্য ঃ ১৫.০০ টাকা
- রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার। ১৯৮৮।
  মূল্য ঃ ২০.০০ টাকা
- ড: বিমলকান্তি সেন
  গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ :
  ইংরেজি - বাংলা; - ২য় সংস্করণ, ২০১৩।
  মূল্য ঃ ২৫০.০০ টাকা
- গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী :
  ১৯১৫-১৯৩০, ১৯৯৪।
  মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা
- **Prof. Panigrahi, P. K., Raychaudhury, Arup, Chanda, Joydeep**
  Proceedings of Indkoha 2016.
  Price : Rs. 500.00
- **Ohdedar, A. K.**
  Book Classification - 1994
  Price : Rs. 200.00
- **Bengal Library Association**
  Phanibhusan Roy Commemorative Volume, 1998.
  Price : Rs. 200.00
- প্রবীর রায়চৌধুরী ও গ্রন্থাগার আন্দোলন।
  গৌতম গোস্বামী সম্পাদিত;
  সহ-সম্পাদক-জয়দীপ চন্দ, ২০১১
  মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা
- **Raychaudhury, Arup, Majumder, Apurba Jyoti, Chanda, Joydeep**
  Proceedings of Indkoha 2017.
  Price : Rs. 500.00
- **Raychaudhury, Arup and others**
  Proceedings of Indkoha 2019.
  Price : Rs. 500.00

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

১. 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী ১৩৫৮-১৪২৮ ● সঙ্কলক ঃ অসিতাভ দাশ ও স্বগুণা দত্ত ● মূল্য ঃ ৫০০.০০ টাকা

২. গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত ● বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী ● ১৯৩১-১৯৪৭ ● মূল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা

৩. রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় ● সূচিকরণ ● সম্পাদনা ঃ প্রবীর রায় চৌধুরী ● মূল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা

৪. প্রমীল চন্দ্র বসু প্রণীত গ্রন্থকার নামা ● ২য় সংস্করণ (সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত)
দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪ ● অলকা সরকার ও ভোমরা চট্টোপাধ্যায় (ধর) ● মূল্য ঃ ১২৫.০০ টাকা

৫. রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় ● বিষয় শিরোনাম গঠন পদ্ধতি ● দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা ● মূল্য ঃ ১২৫.০০ টাকা

৬. রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ● গ্রন্থাগার সামগ্রির সংরক্ষণ ● মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা

৭. ড. কৃষ্ণপদ মজুমদার ● পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগারপরিষদ ● মূল্য ঃ ২৫০.০০ টাকা

৮. রামকৃষ্ণ সাহা ● বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ ● মূল্য ঃ ১২০০.০০ টাকা

৯. **Memorandum of Bengal Library Association ● Price : Rs. 10.00**

১০. **Ohdedar, A. K. The Growth of the library in modern India : 1498-1836 ● Edited by Arjun Dasgupta ● Associate editor : Dr. Krishnapada Majumder, 2019 ● Price : Rs. 300.00**

১১. **Bandopadhyay, Ratna ● Evolution of Resource description ● Price : Rs. 380.00**

PUBLISHED ON 25TH OF EVERY ENGLISH CALENDAR MONTH

Postal Registration No : KOLRMS/83/2022-2024
Regd. No. : R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

Vol. 74 **No. 7** **Editor : Shamik Burman Roy** **October 2024**

CONTENTS

	Page
Katha kao hey anonta atit **(Editorial)**	3
Biren Chand	4
Arun Kumar Roy: A half century bound friendship in Library Movement	
Sanat Bhattacharya	8
Battala Publishers and Bengali Books in the 19th Century: A Survey	
Debabrata Manna	12
The Management Rules of Govt.-sponsored Public Libraries: A Review	
Dr. Madhab Chandra Chattopadhyay	20
Studies in regional history of Hooghly District: A Review	
Association News	
Honorable Anup Kumar Sarkar Condolence Meeting	24
Sushil Kumar Ghosh Memorial Lecture, 2023	25

Printed & Published by Shamik Burman Roy for **Bengal Library Association.** Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014. **Phone : 8276032102. E-mail : blacal.org@gmail.com, Website :http://www.blacal.org,** Printed at **Laser World,** P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, **Phone : 9831161961.** *Editor :* **Shamik Burman Roy 9748702776(WA)**